182. Mc. 927. 10.

রবীন্দ্রকাব্যপাঠ

মনোবিকাশের ধারার অনুসরণ

কাজী আবদুল ওদুদ

১৩৩৪ সাল

মূল্য পাঁচ সিকা

182.Mc.927.10.

রবীন্দ্রকাব্যপাঠ

মনোবিকাশের ধারার অনুসরণ

কাজী আবদুল ওদুদ

১৩৩৪ সাল

মূল্য পাঁচ সিকা

Out of Print.

প্রকাশক

মোহাম্মদ আফজাল-উল্-হক

মোসলেম পাবলিশিং হাউস

৩নং কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা

ঢাকা নয়াবাজার শ্রীনাথ প্রেসে,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৩১ সালে ঢাকা বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর এক অধিবেশনে "রবীন্দ্রনাথ" নামে একটি প্রবন্ধ এই লেখককে পড়তে হয়েছিল। সেইটি স্থানে স্থানে পুনর্লিখিত হয়ে ১৩৩২ সালের "প্রবাসী"র কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান রবীন্দ্রকাব্যপাঠ বইখানি সেই "প্রবাসী"তে প্রকাশিত প্রবন্ধটিরই পুনর্মুদ্রণ, তবে জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হবে।

রবীন্দ্র-প্রতিভা একসময়ে তাঁর কাব্যের এই পাঠকের অপরিসীম আনন্দের কারণ হয়েছিল। সেই আনন্দ-স্পন্দন এই আলোচনাটির নানা ধরণের অসম্পূর্ণতার ভিতরে হয়ত আচ্ছন্নই হয় নাই এই ভরসায় এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল।

ঢাকা
মাঘ, ১৩৩৪

গ্রন্থকার

রবীন্দ্রকাব্যপাঠ

—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ...............

দুইটি কথা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলার কথা স্মরণ ক'রে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখছেন :—

"এক একদিন মধ্যাহ্নে ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম···দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা সহরের নানা উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্ব্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমা মধ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। সেই সকল অতিদূর বাড়ীর ছাদে একটি চিলা কোঠা উঁচু হইয়া থাকিত, মনে হইত তাহারা যেন নিশ্চল তর্জ্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সঙ্কেত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমাণিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়ীগুলিকে কত খেলা কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের

গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়ীগুলোর সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া 'চাই চুড়ি চাই, খেলনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।"

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁর "রবীন্দ্রনাথে" যে একটি চিঠি তুলেছেন তার কতক অংশ এই—

"আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা একটু একটু মনে পড়ে, কিন্তু সে এত অপরিস্ফুট যে ভাল করে' ধর্‌তে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে, এক একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠ্‌ত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। গোলাবাড়ীতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়্‌তাম, মনে কর্‌তাম কি একটা রহস্য আবিষ্কৃত হবে।"

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আর বৈচিত্র্যে কিছু-না-কিছু আনন্দ উপভোগ করা বালক কেন সকল মানুষেরই সাধারণ ধর্ম্ম। তবু বল্‌তে হবে, বালক রবীন্দ্রনাথ সেই "সকল মানুষের" শ্রেণীতে বেমালুম খাপ খেয়ে যান না। বালক বয়সেই অসীমের রহস্যকে এমন সারা প্রকৃতি দিয়ে অনুভব করা এক অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নাই। বালক নচিকেতা নাকি মৃত্যুর গুহায় তলিয়ে গিয়ে অমৃতের উদ্ধার করে এনেছিলেন, তাঁর প্রশ্নে দেখ্‌তে পাই আশ্চর্য্য সমাহিতচিত্ততা। কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিকীর্ত্তিতে যে বৈচিত্র্য, বিপুলতা আর অমর সৃষ্টিমাহাত্ম্য লাভ করেছেন সেটি এই আশ্চর্য্য রহস্যের অনুভবকর্ত্তা বালক রবীন্দ্রনাথের যোগ্য পরিণতি।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষত্বকে অল্প তুটি কথায় নির্দ্দেশ করা যেতে পারে—অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতি আর সন্ধানপরতা। অনুভূতি তাঁর ভিতরে এর চাইতে কিছু কম থাকলে এই অপ্রতিহত সন্ধানপরতার মুখে তিনি হয়ত হতেন একজন বড় দার্শনিক অথবা বড় যোগী। কিন্তু প্রকৃত কবির মত অনুভূতিই তাঁর ভিতরে সব চাইতে প্রবল। এই অনুভূতিরই সঙ্গে-সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে চলেছে সন্ধান। "ফাল্গুনী"র অন্ধ বাউলের মতন সত্যের অরুণ আলো প্রথমে তাঁর ভুরুর মাঝখানে খেয়া নৌকাটির মতো এসে ঠেকে, আর তিনি গান গেয়ে ওঠেন!

প্রথম পর্য্যায়

রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করেন। আশৈশব তিনি সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ; তাই বুদ্ধিমান বালকের পক্ষে এটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গানে ছন্দে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠবার ক্ষমতাও যে তাঁর মজ্জাগত তা'র পরিচয় সেই অল্প বয়সের কবিতায়ও প্রচুর।

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত,
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,
থর থর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্,
বরখত নীরদ পুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
বোল ত সজনী এ দুরু যোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান্
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত
সকরুণ রাধা নাম।

হোক এ অনুসরণ, হোক “আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র”, তবু এ বেশ একটু স্নেহ আর আনন্দের

দৃষ্টিতে দেখবার যোগ্য নয় কি ? কেমন-একটু রসবিলাসী মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে এর ভিতরে !

সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি নিজের বিশেষত্ব প্রথম উপলব্ধি করেন। আর পরলোকগত শ্রদ্ধেয় অজিতবাবুর বিশ্বাস "প্রভাত সঙ্গীতে কবির সমস্ত জীবনের ভাবটির ভূমিকা নিহিত রয়েছে।" মিথ্যা নয়। এর "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায় কেমন এক বিপুল কবিপ্রাণ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে—

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
(ওরে) উথলি উঠেছে বারি ;
(ওরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি··· ;

তাঁর রুদ্ধ প্রতিভা-নির্ঝরিণী প্রকাশের মহাসাগরের ডাক শুনতে পেয়েছে—

ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন।
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন··· ;

"প্রভাতউৎসব" কবিতায় জগতের আনন্দ আর সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি কবির চোখের সামনে কেমন সুন্দর ভাবে খুলে গেছে—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

*　　*　　*

এসেছে সখাসখী বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন্ পুলকে ভরা মন,
ডাকিছে ভাই ভাই আঁখিতে আঁখি তুলি;

আর "অনন্ত জীবন" "অনন্ত মরণ" "মহাস্বপ্ন" "সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়" প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রতিভা কি এক বিরাট সৃষ্টিতেই না আত্মপ্রকাশ কর্‌তে চাচ্ছে।

"চাচ্ছে" কথাটি আমরা ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি; আমাদের বল্‌বার মতলব—প্রকৃত স্রষ্টার সাক্ষাৎ এখনো আমরা পাইনি। † সৃষ্টির জন্য কবির মনে আবেগ জেগে উঠেছে—বিপুল গভীর সে আবেগ; কবির দৃষ্টিও কিছু পরিষ্কার; কিন্তু নিশ্চয়ই এত পরিচ্ছন্ন নয় যাতে তা'র সামনে সৃষ্টি পূর্ণচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারে। "প্রভাত উৎসবে"র পরে "ছবিও গানেও" প্রকৃত স্রষ্টাকে আমরা দেখতে পাইনে। কবির দৃষ্টি এখানে আরো কিছু পরিষ্কার; কিন্তু সামগ্র্যের ধারণায় ত্রুটি রয়েছে ব'লে মনে হয়। পাঠক এর "একাকিনী" কবিতাটির সঙ্গে Wordsworth-এর The Reaper কবিতাটি মিলিয়ে পড়লে হয়ত আমাদের সঙ্গে একমত হতে পার্‌বেন।

রবীন্দ্রনাথকে সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত স্রষ্টারূপে দেখতে পাই তাঁর "কড়ি ও কোমলে", বিশেষ করে এর সনেটগুলোতে। তিনি নিজেও বলেছেন—

---

† অতি বিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'ও এমন সব চরণ আছে যা আর্টিষ্ট রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে কখনই বেরুত না।

প্রথম পর্য্যায়

আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বায়ু এবং বর্ষণ; কিন্তু শরৎকালের "কড়ি ও কোমলে" কেবল আকাশে মেঘের রং নহে সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

কড়ি ও কোমল

কড়ি ও কোমলের প্রথম কবিতায় কবির সাধটি যে ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেয়েছে সবাইকে বল্‌তে হবে তা সুন্দর। "বলাকার" একটি কবিতার কয়েকটি চরণ এই—

কত লক্ষ বরষের তপস্তার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী··· ;

কবিপ্রাণও তেম্‌নিভাবে সংশয়, ব্যথা, আবেগ, উচ্ছ্বাস, সমস্তের ভিতর দিয়ে এক শুভ মুহূর্ত্তে ফুলের মতো পূর্ণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

কড়ি ও কোমলে কবির এই প্রথম সৃষ্টিক্ষমতা নানা ভাবে সার্থকতা খুঁজছে, দেখতে পাচ্ছি। শিশু-কবিতায় রবীন্দ্রনাথের

যে অসাধারণ কৃতিত্ব তারও পরিচয় এতে রয়েছে। ("সাত ভাই চম্পা", "পুরানো বট", "হাসিরাশি" "আশীর্ব্বাদ" ইত্যাদি।) আর কবির দেশাত্মবোধও এর আহ্বান-গীতে ঝঙ্কৃত হচ্ছে—

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কইরে বাঙ্গালী কই।

কিন্তু এর সনেটগুলোই যে সব-চাইতে বেশী প্রশংসার জিনিষ সে-সম্বন্ধে বোধ হয় সব কাব্যরসিকই একমত; প্রায় প্রত্যেকটি সনেটই দামী মুক্তার মতো নিটোল—প্রকাশে, রসে, জমাট।

এইসব সনেটের কতকগুলোর ভিতর যে ভোগের সুর বাজ্‌ছে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট নিন্দা সহ্য কর্‌তে হয়েছে। মনে হয়, নানা অর্দ্ধসত্যের অত্যাচারে আমাদের জাতীয় জীবন বড় ক্লিষ্ট বলেই একটুখানি সংস্কার-বিমুক্ত হ'য়ে কাব্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বার ক্ষমতা আমাদের ভিতরে এখন ব্যাহত। কাব্য আত্মারই এক প্রকাশ; কাজেই এর সৌন্দর্য্যও "ন বলহীনেন লভ্যঃ।"

এই ভোগের "কুসুমের কারাগার" থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পরে কবির অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে ব'লেই যে কবি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তা সত্য নয়। অনেক বড় কবির

ভিতরে এ বিদ্রোহ জাগেনি। তাই বলে তাঁদের কাব্য আমাদের কম প্রিয় নয়। কালিদাস, বিদ্যাপতি, হাফেজ, Burns (বার্ন্‌স), Byron (বায়রন্) প্রভৃতি কবির কথা স্মরণ করে আমরা এ কথা বলছি। আসলে, জীবনে ভোগ অসত্য নয়। আর এই সনেটগুলোর ভিতরে সুপ্রকাশের সৌন্দর্য্যে স্নাত হ'য়ে সেই ভোগের সত্য যথাযথভাবেই ফুটে উঠেছে।

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদেরও বিশেষত্ব আছে। নৈতিক বোধ তাঁর ভিতরে দুর্ব্বল ছিল পরে সবল হয়েছে বলে যে তাঁর মনে এই প্রতিবাদ জেগেছে তা সত্য নয়। "কুসুমের" কারাগারে বদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ভিতরে তেম্‌নি বলবতী, কেননা, এই দুই-ই একই মূল থেকে উৎসারিত হচ্ছে—তাঁর ভিতরকার সেই চিরজাগ্রত রহস্যের সন্ধানপরতা থেকে। নারী সৌন্দর্য্য ত সাধারণতঃ আমরা তুচ্ছ ভেবেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি; যাকে আমরা মহত্তর ভাব বলি, পরে পরের কাব্যে দেখ্‌ব, সেই জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা ইত্যাদির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কবির ভিতরে এমনই প্রবল।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষত্ব তাঁর ভোগের কবিতার ভিতরেও যথেষ্ট পরিস্ফুট। কালিদাসের দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা স্মরণ করে বল্‌ছেন—

> অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ
> অনাবিদ্ধং রত্নং মধু অনাস্বাদিতরসম।

হাফেজ তাঁর "মাশুকের" কথা স্মরণ করে বল্‌ছেন—

কজিয়ে মা বাআদ লাজে শক্কর আফশানে শুমা † ;

আর Burns তাঁর Highland Maryর কথা স্মরণ করে বল্‌ছেন—

How sweetly bloom'd the gay green birk
How rich the hawthorn's blossoms,
As underneath the fragrant shade
I clasp'd her to my bosom !
The golden hours on angel wings
Flow o'er me and my dearie ;
For dear to me as light and life
Was my sweet Highland Mary.

এসব কবিতার ভিতরে ভোগ কেমন আত্মসম্পূর্ণ, যথেষ্ট তৃপ্তি স্বস্তি এ সমস্তে রয়েছে। তবে কালিদাসের ভোগ কেমন গোলাপগন্ধি ; আর হাফেজে, Burns-এ মত্ততা আর আবেগ কিছু বেশী। এসবের সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভোগের স্বরূপ যখন উপলব্ধি কর্‌তে যাই তখন দেখি, কালিদাসের মতন সৌন্দর্য্যের উপাসক তিনি ; মাঝে-মাঝে বুঝতে পারা যায়, এ ভোগে তিনি তৃপ্ত ; কিন্তু মোটের উপর এই ভোগের ভিতরে আকণ্ঠ নিমজ্জনের স্বস্তি যেন তিনি পাচ্ছেন না। সেইজন্য কেমন-একটা ব্যথা তাঁর "বাহু" "দেহের মিলন" প্রভৃতি

† "লাল শীরীন ঠোঁট প্রিয়ার রোজ পাই জবাই লাখ লাখ চুম্বনে।" কবি নজরুল ইসলামের অনুবাদ।

কবিতায় বর্ত্তমান। আর সব ভোগ সব অনুভূতির ভিতরে পরম রহস্যমণ্ডিত সত্যের সন্ধানই যে তাঁর মজ্জাগত মানসীর "হৃদয়ের ধন" কবিতায় তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে।

নাই নাই কিছু নাই শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে!

মানসী

"কড়ি ও কোমলের" পরে মানসীতে দেখতে পাই, কবির প্রকাশ-সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ আরো বিক্ষুব্ধ, জীবন হর্ষে আর ব্যথায় জটিল হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই জটিলতায় তাঁর দৃষ্টি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে যাচ্ছে না। উপরে "হৃদয়ের ধন" কবিতার কয়েক চরণ যে উদ্ধৃত হয়েছে তা'তে কবি তাঁর সমস্ত কথা নিখুঁত আর অব্যর্থভাবে পাঠকের সাম্‌নে ধর্‌তে পেরেছেন।

"মানসীকে" মোটামুটি দুইভাগে ভাগ ক'রে পড়া যেতে পারে। প্রথমভাগের বিশেষত্ব এর প্রেমের কবিতা। মানসীর চরণাঘাতে কবিহৃদয়ে সৌন্দর্য্য যেন সহস্রধারে উচ্ছ্রিত হ'য়ে উঠেছে। মানসীকে কবি কখনো বল্‌ছেন—

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।
দেখি ও নয়নে নিমিষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতাদুটি
পড়ে কি ঢুলে।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়োনা,
এসেছি ভুলে।

কখনো ভুল ভেঙে যাওয়ায় কবি বল্‌ছেন—

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি!

কখনো বল্‌ছেন, বিরহেই তিনি ছিলেন ভালো—

তবু সে ছিনু ভালো আধো আলো আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।

কখনো শূন্যহৃদয়ে তিনি বসে' আছেন, মনে তাঁর আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌ছে, কবে—

পাগল ক'রে দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে, মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।

কখনো সংশয়ের আবেগে কবি স্থির থাক্‌তে পার্‌ছেন না—

ভালো বাসো, কি না বাসো বুঝিতে পারিনে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি
সর্ব্বগ্রাসী আঁখি।

......

কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে, প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

কখনো এক অপূর্ব্ব বিচ্ছেদের ছবি আঁক্‌ছেন—

সেই ভালো, তবে তুমি যাও!
তবে আর কেন মিছে করুণ নয়নে
আমার মুখের পানে চাও!

আবার কখনো সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিয়ে কবি বল্‌ছেন—

তবু মনে রেখো···
তবু মনে রেখো যদি মনে পড়ে' আর
আঁখি-প্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

এইসব কবিতায় অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিও অনুপম সৌন্দর্য্য-ভঙ্গিমা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এগুলো যে অ-"বাস্তব" নয় তার ভালো একটি প্রমাণ আমরা জানি। আমাদের এক সুবিখ্যাত কবি-বন্ধু তাঁর "মানসী" খানিতে এই সব কবিতার বহু চরণের পাশে-পাশে তারিখ দিয়ে রেখেছেন।

'মানসী'তে কবি দক্ষ স্রষ্টা হ'য়ে উঠেছেন। ভাব, ছন্দ, প্রকাশ-ভঙ্গিমা সমস্তেরই উপর পর্য্যাপ্ত অধিকারের জন্যে এই মানসীর সময় থেকে যত কবিতা তিনি লিখেছেন তা'র প্রায় প্রত্যেকটিতেই কিছু-না-কিছু প্রশংসাযোগ্য আছে। জগতের অতি অল্প কবি সম্বন্ধেই এত বড় কথা বলা যেতে পারে। আমাদের কথা যেন কেউ ভুল না বোঝেন। বল্‌ছি না, রবীন্দ্রনাথ যত কবিতা লিখেছেন তা'র প্রায় সবই শ্রেষ্ঠ কবিতা, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কাব্যে যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোনো কবির ভিতরেই তা পরিমাণে বা সংখ্যায় বেশী নয়, এমন-কি অল্পই। এখানে আমরা শুধু এই কথা বলতে চাচ্ছি যে, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সন্ধানপরতা আর প্রকাশ-ভঙ্গিমার গুণে সাধারণ লেখকের স্তরে তিনি প্রায় কখনো নেমে পড়েননি; এটি যেন তাঁর প্রতিভার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

যে-সমস্ত কবিতার উল্লেখ করা হয়েছে, তা ভিন্ন 'মানসী'র প্রথম ভাগে "ক্ষণিক মিলন", "একাল ও সেকাল", "আকাঙ্ক্ষা", "নিষ্ফল প্রয়াস", "নারীর উক্তি", "পুরুষের উক্তি" প্রভৃতি আরো সুন্দর কবিতা রয়েছে। কিন্তু এসমস্তের মুকুটমণি হচ্ছে "নিষ্ফল কামনা।"

বৃথা এ ক্রন্দন !
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা !
রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।

প্রথম পর্য্যায়

সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!

* *

এর ছন্দ, যতি, ভাবাবেগের বিপুলতা, চিন্তার অতলস্পর্শতা, প্রকাশ-ভঙ্গিমার অব্যর্থতা, সমস্তের মিলনে সৃষ্টি যে অপরূপ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে কি কথায় তা'র যোগ্য প্রশংসা হ'তে পারে! ৭৯ লাইনের কবিতা এটি, অথচ কোথাও এতটুকু ত্রুটি,এতটুকু দীনতা, প্রকাশ পায়নি।—এই কবিতাটিকে আমরা কত উঁচুতে স্থান দিই তা শুধু এই কথাতেই বোঝা যাবে যে, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যে এ রকম আর দুটি কবিতার সাক্ষাৎ আমরা পাই—চিত্রার "উর্ব্বশী" আর বলাকার "বলাকা" কবিতাটি। এগুলো কাব্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি একথা বল্লে অতি সামান্যই বলা হয়। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে আরো আছে। অনুভূতির আগ্নেয়োচ্ছ্বাসমুখে কি গগনস্পর্দ্ধী সৃষ্টির অধিকার বিধাতা মানুষকে দিয়েছেন এসব তা'রই প্রমাণ।

মানসীর দ্বিতীয় ভাগের অর্থাৎ শেষের দিকের অনেক কবিতায় দেখ্‌ছি, কেমন বেদনামাখা কবি-হৃদয়,—বিশ্ববিধানে জড়প্রকৃতির নির্ম্মমতার জন্য এই বেদনা ("নিষ্ঠুর সৃষ্টি", "সিন্ধু তরঙ্গ" প্রভৃতি), নিজেকে ক্ষুদ্র জীবনের কারাগারে বন্দী দে'খে এই বেদনা। তাঁর বিরাট্ আত্মা সংসারে পরিব্যাপ্ত হবার জন্যে ভিতরে-ভিতরে কামনা কর্‌ছে। এতদিনের যে একলা-মনে রস-সম্ভোগের জীবন, তা'র মায়া কাটাতে তাঁর বাজে, অথচ কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মনে যথেষ্ট প্রবল হ'য়ে দেখা দিয়েছে !

কবির এই অবস্থার সুন্দর চিত্র বিধৃত হ'য়ে আছে এর 'ভৈরবী গান' কবিতাটিতে। তাঁর এই সময়কার এমন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি-ক্ষমতা, এত সৌন্দর্য্য-উপভোগ, সব যেন ফেটে চৌচির হ'য়ে ভিতরকার বেদনাময় কবিহৃদয় খুলে ধরেছে।—

যদি কাজ নিতে হয় কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে ?
কাঁদে শিশির-বিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে।
কেন অকুল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে।
শেষে দেখিব, পড়িল সুখ-যৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্ত-বায়ু মিছে চলে গেল
শ্বসিয়া,

সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া।

* * *

তবু সাম্‌নে না চ'লে তিনি পারছেন না; তাঁর ভিতরকার দুর্জ্জয় শক্তি-স্রোত আপনা থেকে এগিয়ে চলেছে।

ওগো, থাম, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তা'রে আর ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রু-সজল ভৈরবী আর
গেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়ন-বাষ্পে ছেয়ো না!

* * *

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
আপনারে তারা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর
বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দোলায় দুলাবে।
ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে!
যাবো আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে!

আস্তে-আস্তে চলার আনন্দই তাঁর ভিতরে কেমন জমাট হ'য়ে উঠেছে, মানসীর 'পরিত্যক্ত' কবিতায় তার পরিচয় রয়েছে। বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হ'য়েও তিনি আর দমছেন না। প্রতিভার এই স্বাতন্ত্র্য বড় রহস্যপূর্ণ।

বন্ধু এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি?
শিখর-গুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে?

'মানসী'র "বঙ্গবীর", "ধর্ম্মপ্রচার" প্রভৃতি ব্যঙ্গ কবিতার ভিতরেও যে-বেদনার সঞ্চার হয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা এক বড় জীবনেরই গর্ভবাস থেকে মুক্ত হওয়ার বেদনা। বাঙালীর বোতাম-আঁটা পোষমানা প্রাণের তলে বাস্তবিকই দুরন্ত কামনা সর্পসম কবির মনে ফুঁস্‌ছে—

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন—
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।

গুরু গোবিন্দের পরই নিষ্ফল উপহার কবিতাটি বেশ বিশিষ্টতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। "সুরদাসের প্রার্থনা" "গুরু

গোবিন্দ” প্রভৃতি ভালো কবিতা, কিন্তু সৃষ্টি-হিসাবে হয়ত নিখুঁৎ নয়। এসমস্ত কবিতায় এমন-একটা গতি ছন্দের ভিতর দিয়ে ধেয়ে চলেছে যে তা'রই জন্য সৃষ্টি-কমল যেন পূর্ণভাবে [redacted] মেল্‌তে পারেনি! নিষ্ফল উপহারে দেখ্‌ছি, কবি তাঁর সেই গতির রাশ খুব জোরে টেনে ধরেছেন এবং রাশ টেনে [redacted] তিনি যে এক চমৎকার ভঙ্গিতে রথ চালনা করতে পারেন, তার পরিচয় দিয়েছেন। এর সর্ব্বত্র কি দৃঢ় সংযম! এক-একটি স্তবক এক-একটি ভাব প্রায় পুরোপুরি প্রকাশ করছে বলে তাদের সমবায়ে সমগ্র কবিতাটিতে যে ভাবধ্বনি উঠ্‌ছে তা গম্ভীর আর উদাত্ত।

মানসীর শেষের দিকে আরো কতকগুলি সুন্দর কবিতা আছে। ধ্যান, অনন্ত প্রেম, উচ্ছৃঙ্খল প্রভৃতি। ধ্যান প্রতি-ভার প্রাণ। কবি নিজের সেই ধ্যানী রূপ যেন উপলব্ধি করতে পেরেছেন—

তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন ওই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।

উচ্ছৃঙ্খল কবিতাটি এক সুন্দর সৃষ্টি। কবির মনোজগৎ এখন যথেষ্ট বিস্তৃত, সেই বিস্তৃত মনোজগতের বুকে উচ্ছৃঙ্খলকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন।

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল।
ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
সৃজনের এক ভুল।
দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।
এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাবো,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
দু'খানি বাহুর ডোরে।

নবীন কবি নজরুল ইস্‌লামের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী'র আবেগ এর চাইতে অনেক বেশী; কিন্তু সে আবেগ এমন সত্যদৃষ্টি স্রষ্টার হাতে নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই তার অনেকখানি কাব্য-হিসাবে অকিঞ্চিৎকর। * অতি বিপুল আবেগ সৃষ্টিক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হলে কি অপরূপ কাব্য হতে পারে, বায়রনের (Byron) চাইল্ড্ হ্যারল্ডের (Childe Harold) শেষের দিকের সমুদ্র-বন্দন তার এক বড় প্রমাণ।

* [redacted] অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সত্যকার প্রতিভার স্পন্দনও যে এর ভিতরে বুঝতে পারা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সোনার তরী

"মানসী"র যুগের পর রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক বড় পরিবর্ত্তন এসেছিল। এতদিন শুধু একলা-মনে কবির জীবন তিনি যাপন করছিলেন। "সোনার তরী" যে যুগের লেখা তখন তিনি জমিদারী-কাজের ব্যপদেশে বৃহৎ বাস্তব জগতের সঙ্গে মিলবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর গভীর সবল প্রকৃতি এই বিপুল বাহিরকে হজম করে যে কি অলৌকিক পরিপুষ্টি লাভ করেছে, "সোনার তরী" "গল্পগুচ্ছ" "চিত্রা" প্রভৃতি তা'র দৃষ্টান্ত। এই যুগ রবীন্দ্র-সাহিত্যে "সাধনার যুগ" নামে খ্যাত ; এবং অনেকের বিশ্বাস, এই যুগই কবি-রবীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ যুগ। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমরা পরে করব।

মানসীর সুরের সঙ্গে সোনার তরী, চিত্রা, ইত্যাদির সুরের বেশ পার্থক্য রয়েছে। সোনার তরী প্রভৃতির কবিহৃদয় নিশ্চয়ই পূর্ণতর, পরিপুষ্টতর। রবীন্দ্রনাথের যে তীক্ষ্ণ অনুভূতি আর সন্ধানপরতা তা যেন এখানে এক পরম সৌন্দর্য্যময় প্রকাশে নিজের সার্থকতা উপলব্ধি করেছে। তাই সোনার তরী, চিত্রা, গল্পগুচ্ছ, প্রভৃতির ভাব শক্তিমান্ আনন্দময় দ্রষ্টার ভাব—ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্তের অন্তরের সৌন্দর্য্য আর সত্য কবি নিবিড়ভাবে অনুভব করছেন, আর এক অপূর্ব্ব [illegible] সে-সব শরীরী হয়ে উঠছে।

কিন্তু মানসীর সুর সাধারণতঃ সঙ্গীতের সুর। যে অনুভূতি কবির মনে জাগ্‌ছে তা তীক্ষ্ণ; সৌন্দর্য্যও তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে নানা রেখা ও বর্ণ বৈচিত্র্য নিয়ে; কিন্তু এসব মূর্ত্তির মতো গড়ে তোলার দিকে কবির তত চেষ্টা নয়, যত এর সৌন্দর্য্যে আবেগে নিজে মেতে ওঠা—নৃত্য করা। এই আনন্দময়, আবেগময়, বেদনাময়, চির-আন্দোলিত, কবিহৃদয়ের স্পর্শ যাঁদের কাছে অপূর্ব্ব "মানসী" তাঁদের প্রিয় কাব্য।

রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকাশ-ভঙ্গির এই দুই রূপ—রহস্যময় বংশীবাদকের রূপ, আর সমাহিতচিত্ত দ্রষ্টার রূপ—শুধু তাঁর যৌবনের রচনায় নয়, পরে পরের রচনাও প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে মানসী, কল্পনা, ক্ষণিকা খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, অন্যদিকে সোনার তরী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, চৈতালি, কথা, কাহিনী, নৈবেদ্য, বলাকা, প্রভৃতি দাঁড় করিয়ে আমরা এ কথা বল্‌ছি।

(শুধু নিজের মনে বদ্ধ না থেকে বৃহৎ জগতে ছড়িয়ে পড়্‌বার জন্যে কবির মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌ছিল, সোনার তরীতে তা কতকটা সার্থক হয়েছে। কতকটা বল্‌ছি এই জন্যে যে, যে-জগতে এখন ঘুরে-ফিরে তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন, গ্যেটের মেফিস্‌টোফিলিস্‌এর ভাষায়, তা ক্ষুদ্র জগৎ (Little World). (রবীন্দ্র-প্রতিভার জন্যও যে তা Little World তা পরে

দেখ্‌ব।) সংসারের নানা সুর তাঁর চিত্তে এখন কিছু প্রবেশাধিকার পেয়েছে। আর সবচাইতে বড় কথা এই যে সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের যে একটি আনন্দময় রূপ আছে সেটি কবির চোখে পড়েছে।

আমাদের বৈরাগ্য-প্রপীড়িত তামসিক জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যে তীব্র প্রতিবাদ সোনার তরী কাব্যেই তার সূচনা নয়। কিন্তু যে সত্যের উপর দাঁড়িয়ে কবি এই প্রতিবাদ করেছেন। তার প্রথম পর্য্যাপ্ত উপলব্ধি দেখ্‌তে পাই এই সোনার তরীতে ও সোনার তরীর যুগের গল্পগুচ্ছে।) 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতে দেখছি, এক অদ্ভুত সাধক আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার খেয়ালে আর সব দিকে উদাসীন হয়ে শুধু নিজের খেয়াল মতোই চলেছিল; শেষে তার চোখ পড়্‌ল প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার উপর, সে দেখ্‌লে, এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার বুকে কি অমৃত লুকানো রয়েছে। অর্থাৎ দেশেরই জড়তাগ্রস্ত খেয়ালী-চিত্তকে প্রাত্যহিক জীবনের ভিতকার অমৃতের সন্ধান কবি দিচ্ছেন।

এমন সময়ে সহসা কি ভাবি'
চাহিল সে মুখ ফিরে,
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,

ছোটো-ছোটো তরী পাল তুলে যা'য়
মাঝি বসে গায় গান।

* * *

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ
সুন্দর লোকালয়,
প্রতিদিবসের হরষে-বিষাদে
চির-কল্লোলময়
স্নেহ-সুধা লয়ে গৃহের লক্ষ্মী
ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতিদিবসেরে করিছে মধুর
প্রতিদিবসের কাজে।

* * *

ছোটো-ছোটো ফুল ছোটো ছোটো হাসি,
ছোটো কথা, ছোটো সুখ,
প্রতিনিমিষের ভালোবাসাগুলি,
ছোটো-ছোটো হাসিমুখ।
আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া
মানবজীবন ঘিরি
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই
দেখিতেছে ফিরি-ফিরি'।

জাগতিক জীবন, প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা, যে অমৃতময় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য-সাধনায় এ এক বড় সত্যের উদ্‌ঘাটন। এ মন্ত্রের দর্শন কবি পেয়েছেন বহু পরে "নৈবেদ্য" কাব্যে—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি
সে আমার [redacted]।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।......

কিন্তু কতরূপে কত ভাবে যে কবি বারবার এই সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন, কাব্যরসিক ও সত্যজিজ্ঞাসু—দুয়েরই তা অনুধাবনের বিষয়।

সোনার তরীতে রবীন্দ্র-প্রতিভায় যেন বান ডাক্‌তে চাচ্ছে। এখানে এক মহা-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কবিহৃদয় আমাদের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত—ভাব, ছন্দ, সামগ্রোর ধারণা, সমস্তই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। আর তাঁর বিপুল সৌন্দর্য্যানুভূতি সমুদ্র-ফেনার মতনই এক দিগন্তবিস্তৃত স্বপ্নমাধুরী রচনা করেছে। কিন্তু সৃষ্টি হিসাবে সোনার তরীর খুব বেশী কবিতা হয়ত অনবদ্য নয়,—কবির চোখে লেগে রয়েছে সৌন্দর্য্যের কেমন এক স্বপ্নাবেশ। সোনার তরীর মানস-সুন্দরী কবিতাটিতে কি অদ্ভুত সৌন্দর্য্য পূজা! কিন্তু এই পূজায়ও লেগে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রকৃতিগত রহস্যের সন্ধানপরতা।

(কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির সৃষ্টি না হলেও, বলা যেতে পারে, সৌন্দর্য্যানুভূতির গভীর তন্ময়তার সৃষ্টি এই সোনার তরী; তাই রবীন্দ্র-প্রতিভার এও এক বড় দান। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতরে,

নরনারীর প্রেমপ্রীতির ভিতরে, এই যে তন্ময়তা এরই থেকে উদ্ভূত হয়েছে উচ্চতর আত্মপ্রকাশ ও পূর্ণতর সৃষ্টি।)

সোনার তরীর 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি তাঁর কথাটী কত স্পষ্ট করে বলেছেন! আগে আকাশের চাঁদ কবিতাটি যে আমরা আংশিক উদ্ধৃত করেছি, তার চাইতে এর প্রকাশ ভঙ্গিমা অনেক উৎকর্ষ লাভ করেছে। অন্তরের সরসতার সত্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের প্রচলিত মতবিশ্বাসের মোহ কবি কতটা এড়িয়ে উঠেছেন তারও স্পষ্ট পরিচয় এতে রয়েছে।

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা······
······একি শুধু দেবতার?
······আমাদেরই কুটীর কাননে
ফোটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতাচরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

সোনার তরীর "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি বাস্তবিকই এক অপরূপ সৃষ্টি—হয়ত সমস্ত "সোনার তরী" কাব্যখানির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এটি। "মানসী"তে দেখেছি, কবি নিষ্ঠুর সৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু জগতের কাঁচা কোমল প্রাণের সঙ্গে তার যে চিরসংগ্রাম তার ফলাফল কি, সে-কথাটি তাঁর দৃষ্টিতে তেমন ফুটে ওঠেনি। এই "যেতে নাহি দিব" কবিতায় সেটি অপরূপ বেদনায় বিকশিত হয়ে উঠেছে!

* * *

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়!

* * *

............তবু প্রেম বলে,
"সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি।" তাই স্ফীতবুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গর্ব্বকথা।
মৃত্যু হাসে বসি'। মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই

[redacted] সংসার, বিষণ্ণ নয়ন'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চিরকম্পমান। * *

মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি' দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো !

ভাষার শাণিত দীপ্তিতে, সবল ছন্দোগতিতে, দৃষ্টি পরিচ্ছন্নতায় ও অব্যর্থতায়, ভাবের দৃঢ়-সম্বদ্ধতায়, রবীন্দ্রনাথে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির যে এটি অন্যতম, সে-সম্বন্ধে কেউ ভিন্নমত পোষ করবেন কি না জানিনা।

সোনার তরীর "পুরস্কার" কবিতাটির অনেক জায়গা কবি নিজের কথা এমন চমৎকার ভঙ্গিতে প্রকা করেছেন, ছোটোখাটো সত্য এমন রসময় মূর্ত্তি নিয়ে ফু উঠেছে, যে, তা'রই জন্য এ-কবিতাটি চিরকাল পাঠকের হৃদয়রঞ্জ

করবে। এর বাণী-বন্দনাটি কত সুন্দর! কবি-প্রতিভার ভিতরে যে একটি নির্লিপ্ততা বা আত্মসম্পূর্ণতা আছে, যার গুণে কবি স্রষ্টা, তা'র কত মনোরম বর্ণনা কবি দিয়েছেন—

কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়
নিমেষে প্রকাশে নিমেষে মিলায়,
বালুকার পরে কালের বেলায়
ছায়া-আলোকের খেলা!
জগতের যত রাজা-মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তা'রা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখ লাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
তা'র মাঝে শুধু ধ্বনিতেছে সুর,
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপূর
মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়-তরণী,
জানে না আপনা, জানে না ধরণী,
সংসার-কোলাহল।

*　　*　　*

বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী,
বারেকের তরে ভুলাও জননী,

কে বড় কে ছোটো কে দীন কে ধনী
কেবা আগে কেবা পিছে,

* * *

তুমি মানসের মাঝখানে আসি'
দাঁড়াও মধুর মূরতি বিকাশি',
কুন্দবরণ সুন্দর হাসি
বীণাহাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবি শশী তারা,
সারি-সারি যত মানবের ধারা
অনাদি কালের পান্থ যাহারা
তব সঙ্গীত স্রোতে।
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধূ খুলি' কেশজাল
নাচে দশদিক্ হ'তে।

জগতের কি কাজে লাগ্‌তে কবির সাধ যায় সে-সম্বন্ধে কবি বাণীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

লক্ষযুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।
এ-ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনা করিতে বাদ-প্রতিবাদ,

* * *

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণ-মন খুলি
পুষ্পের মতো সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশ-ভালে।
অন্তর হতে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীত-রসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।

* * *

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।
সংসার-মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাবো করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তা'র পর ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহ-সুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে-অধরে,
আরেকটু মধু দিয়ে যাবো ভ'রে
আরেকটু স্নেহ শিশু-মুখপরে
শিশিরের মতো র'বে।

রবীন্দ্রনাথের নিছক সৌন্দর্য্য-পূজার এ এক অসাধারণ সার্থকতা। তাঁর নিছক সৌন্দর্য্য-দৃষ্টির সাম্‌নেই মূর্ত্তি ধ'রে উঠেছে কেমন আড়ম্বরহীন অথচ গভীর সত্য—অমৃতমাখা সত্য কাব্যের যা উপজীব্য। কবি এখানে মানুষের ছোটোখাটো কাজে লাগ্‌তে চেয়েছেন। একহিসাবে কাব্য মানুষের জীবনের এমন ছোটোখাটো কাজেই লাগে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা মনে [redacted] সামান্য কাজ, মানুষের জীবনের জন্য তা যে সত্যই অসামান্য।

সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতাটি সুবিখ্যাত,—কাব্যরসিকের চির-আদরের সামগ্রী। চিরশ্যাম ধরণীর নিগূঢ় প্রাণরস কবির চিত্তকে একেবারে বিভোর ক'রে তুলেছে।

ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই ;
দিগ্‌বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো......
..........হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে-পুলকে
প্রবাহিয়া চ'লে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে ; ... ...

এ-কবিতাটিতে বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য "বিশ্বপ্রকৃতি"র [redacted] কবির পরম নিবিড় যোগ। মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁর যেটুকু সহানুভূতি জন্মেছে তা "আঘাত-সংঘাত"-পূর্ণ

মানুষের জীবনের সঙ্গে তেমন নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষ যতখানি অবিচ্ছেদে যুক্ত তা'রই সঙ্গে। সেই আঘাত সংঘাত-পূর্ণ বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে তাঁকে দণ্ডায়মান দেখতে পাই এর পরে 'চিত্রা' কাব্যে।

সোনার তরীরশেষের কবিতায় দিগন্তবিস্তৃত সৌন্দর্য্যসাগরের বুকে কবির যে নিরুদ্দেশ যাত্রা অদ্ভুত তা'র সৌন্দর্য্য—

বলো দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা [redacted] সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার,
ঊর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাসো শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না ব'লে।

এই নিরুদ্দেশ যাত্রাকে নিছক নিরুদ্দেশ যাত্রা কল্পনা ক'রে কাব্যরসিক আনন্দ পেতে পারেন; আবার কারো-কারো মনে

হ'তে পারে, এই অপরিচিতার নয়নে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার দ্যুতি।

মোটের উপর সোনার তরীর ভাব আনন্দময় রসতন্ময় দ্রষ্টার ভাব, কিছু বেশী সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাও তা'তে আছে। কিন্তু শুধু এই-ই নয়। এই দৃষ্টির আনন্দ আর পরম সৌন্দর্য্যতন্ময়তার মধ্যেও জায়গায়-জায়গায় দেখ্‌ছি, কি-এক গভীরতার [redacted] কবির আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। "সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় কবি অনুভব কর্‌ছেন—

……মানব-হৃদয়সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে-পলে
আপনি সে নাহি জানে, শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তা'রে,……
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পূ'রে।
প্রাণভরা ভাষাহারা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমাপানে ; তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাড়ীর টানে
আমার এ-মর্ম্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝখানে
কোলের শিশুর মতো ………… ;

'ঝুলন' কবিতাটিতে কবির চিত্ত যে বিষম দোল খাচ্ছে, সে শুধু খেয়ালের দোল নয়—

দে দোল দোল।
দে দোল দোল।
এ মহা সাগরে তুফান তোল।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয়-রোল।
বক্ষ-শোণিতে উঠেছে আবার.
কি হিল্লোল!
ভিতরে-বাহিরে জেগেছে আমার
কি কল্লোল……… ;

কবি নিজের হৃদয়-যমুনায় এমন-এক অতলস্পর্শ গভীরতা অনুভব করছেন যার অন্য নাম তিনি দিয়েছেন মরণ—

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে!
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে…… ;

আর কবি নিজে তাঁর 'আমার ধর্ম্ম' প্রবন্ধে বলেছেন—"বড়-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাহিরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, সোনার তরীর বিশ্বনৃত্যে।"—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

চিত্রা

এর পর চিত্রাতে দেখি, 'দৃষ্টির আনন্দ' আর 'বাঁশির ব্যথা' যুগপৎ কবির সৃষ্টিতে চলেছে। "সুখ" কবিতায় তিনি বলছেন—

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা; মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু আননের
হাসির মতন.........

কিন্তু 'সন্ধ্যায়' কবি ব'সে-ব'সে ভাব্‌ছেন,—

ক্রমে ঘনতর হ'য়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব-পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হ'তে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্য-পানে—"আরো কোথা?" "আরো কতদূর?"

একদিকে কবির মোহন তুলিকাস্পর্শে উর্ব্বশী জেগে উঠেছে—

যুগ-যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশি।

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি, দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা......... ;

আর-একদিকে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় যাঁর চেহারা কবির সাম্‌নে আস্‌ছে তাঁর সৌন্দর্য্য উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য নয়—

মৃত্যুরে করি না শঙ্কা! দুর্দ্দিনের অশ্রুজল-ধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি'—তারি মাঝে যাবো অভিসারে
তা'র কাছে,—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম-জন্ম ধরি'! কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তারে
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি' রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর-পানে
............শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত—ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
............দহিয়াছে অগ্নি তা'রে
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তা'রে করেছে কুঠারে,

সর্ব্বপ্রিয় বস্তু তা'র অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি' জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন ;—

* * *

অজিত-বাবু যে বলেছেন—সোনার তরী চিত্রা ও চৈতালির মাধুর্য্যসম্পন্ন জীবনের সঙ্গে কথা কল্পনা ক্ষণিকা প্রভৃতি পরবর্ত্তী কাব্যের জীবনের যে বিচ্ছেদ সেটি এমন গুরুতর যে এ-দুটি দুজন স্বতন্ত্র লেখকের জীবন বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না, একথা পূরোপূরি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা বরং দেখ্‌তে পাচ্ছি, কল্পনার আগে একই-সঙ্গে আনন্দ আর ব্যথার উচ্ছ্বাসে 'চিত্রা' বিচিত্র হ'য়ে দেখা দিয়েছে। সোনার তরীর নিবিড় রসানুভূতির মধ্যেও যে এর আভাস বিদ্যমান, তাও আমরা দেখেছি।

আর রবীন্দ্র-প্রতিভার পক্ষে এটি খুবই স্বাভাবিক। অনুভূতি যাঁর ভিতরে এত তীক্ষ্ণ, আর স্বভাবতই সন্ধান যাঁর ভিতরে এমন অপ্রতিহত, নানা পরস্পরবিরোধী ভাবও তাঁর ভিতরে ওতপ্রোত হ'য়ে থাক্‌তে বাধ্য।

সোনার তরীতে দেখেছি, রবীন্দ্রপ্রতিভায় বান ডাকবার উপক্রম হয়েছে। চিত্রাতে দেখছি, সত্যই সে-বান ডেকেছে। তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য্য যেন সহস্র ছটায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সুরসভাতলে উর্ব্বশীর নৃত্যের মতনই কি যে তা'র সৌন্দর্য্য তা'র পূরোপূরি বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। *

---

* সোনার তরীর মাঝামাঝি থেকে "চিত্রা"র মাঝামাঝি পর্য্যন্ত [illegible] জোয়ারের স্থিতিকাল বল্লে বোধ হয় অনেকখানি বেশী নির্ভুল [illegible]।

চিত্রায় নানা ধরণের কবিতা স্থান পেয়েছে। নিছক সৌন্দর্য্য-পূজাহিসাবে "চিত্রা" "সুখ" অতি সুন্দর কবিতা। 'সুখ' কবিতায় [redacted] সরল সুখ কবির ছন্দে কি সহজ সরল অথচ সবল ভাবে ফু'টে উঠেছে। "জ্যোৎস্না রাত্রে" কবিতায় কবি কেমন-এক তৃষ্ণায় কাতর—নিদ্রাহীন। সৌন্দর্য্যের এক দিব্যমূর্ত্তি চাক্ষুষভাবে দেখবার জন্যে কবির মনে যে আকুলতা জেগেছে তা কেমন বিচিত্র হ'য়ে ফু'টে উঠেছে। কবির এই রহস্য-অভিসারী মনোভাবের সঙ্গে খুব বেশী পাঠকের সহানুভূতি না হ'তে পারে; কিন্তু তা'র জন্যে এর শিল্পগৌরব ম্লান হয় না। কবি অধিকারী হ'য়ে কাব্য লেখেন, পাঠকের বেলায়ও সেই অধিকারের কথা একেবারে ভু'লে গেলে চলবে কেন।

এর 'সন্ধ্যা' কবিতাটি এক চমৎকার সৃষ্টি। কিন্তু সন্ধ্যার সৃষ্টি তত নয় যত কবির প্রতিভার এক সন্ধিক্ষণের সৃষ্টি।—এখানে বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রের মাধুর্য্য থেকে চোখ একটু উঠিয়ে কবি দূরে বিশ্বমানবের ক্ষেত্রের "কত যুদ্ধ কত মৃত্যুর" ছবির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

এর পরই "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটি। রবীন্দ্র-প্রতিভা-নির্ঝরের এ আর-এক স্বপ্ন-ভঙ্গ। এর কয়েক লাইন উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। এ কবিতাটি সম্বন্ধে বেশী-কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় এটি যে আমাদের প্রাণের বস্তু হবে, এ খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্য-

হিসাবেও এ অমূল্য। "মহাজীবনে"র জন্য মানুষের আত্মায় মাঝে-মাঝে যে ক্রন্দন জাগে, তা'র কি অসাধারণ প্রকাশ এতে বর্ত্তমান !

এর কাছাকাছি দাঁড় করানো যেতে পারে পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথের 'মহাত্মা গান্ধী'-কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-পূজার চরম সার্থকতা 'উর্ব্বশী'। কারো-কারো মতে এটি-ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আমাদের ধারণা কি তা আগেই বলেছি। কিছু ভিন্ন ধরণের হ'লেও বায়রণের (Byron) সমুদ্র-বন্দনের সঙ্গে এই উর্ব্বশী কবিতাটির কিছু সাদৃশ্য আছে। সুরের ভিতরেই সমুদ্রের কল্লোল আর তরঙ্গবিক্ষেপ কানে বাজে।

চিত্রার 'বিজয়িনী,' 'পূর্ণিমা', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতিও সুন্দর কবিতা। কিন্তু 'ব্রাহ্মণ' 'পুরাতন ভৃত্য' প্রভৃতি কবিতায় দেখছি, কবি বাস্তবিকই তাঁর সৌন্দর্য্যপূজার 'অখিল মানসস্বর্গ' ছেড়ে মাটির ধরণীর মহিমার পানে নির্ণিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

"ব্রাহ্মণ" কবিতার বর্ণনভঙ্গী আর ছন্দোগতি খুব লক্ষ্যযোগ্য। কবির দৃষ্টি সূর্য্যের আলোর মতন পরিষ্কার অথচ অনাড়ম্বর। ছন্দোগতিতে সত্যকার ব্রাহ্মণেরই সংযমের শুচিতা।

পুরাতন ভৃত্যের মতন চমৎকার সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুচ্ছে আরো করেছেন। এ-কবিতাটিতে বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য, এর অতি অনাড়ম্বর অথচ অতি অব্যর্থ শব্দপ্রয়োগ—

শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে
আনি তার টিকি ধ'রে—
বলি তা'রে, "পাজি, বেরো তুই আজি,
দূর করে দিনু তোরে।"
ধীরে চলে যায়, ভাবি, গেল দায় ;—
পরদিন উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে
ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ,
অতি অকাতর চিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তা'রে,
মোর পুরাতন ভৃত্য।

"ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি" কথাটার গায়ে কি অমৃত মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে!

অজিত-বাবু যে বলেছেন, চিত্রাতে আর চৈতালিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে খুব বড়-একটা সম্পূর্ণতা লাভ হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। চৈতালির সনেটগুলো বেশী প্রশংসাযোগ্য এইজন্যে যে, এর অনেকগুলোতে গভীর জ্ঞান অতি অল্প কথায় সুন্দর রূপ নিয়ে ফু'টে উঠেছে। কবির মানস-প্রকৃতি যে এখন কত সবল তা'র পর্য্যাপ্ত পরিচয় রয়েছে এই চৈতালির সনেটগুলোর ভিতরে।

এইবার চিত্রার 'অন্তর্য্যামী,' 'জীবন-দেবতা' প্রভৃতি সুবিখ্যাত কবিতা-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর্‌বার সময় এসেছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'কে নিয়ে তাঁর সমালোচকরা যথেষ্ট গোলমালে প'ড়ে গেছেন। আমাদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটি অত গোলমেলে ব'লে মনে হয় না। আমরা সোজা কথায় বল্‌তে চাই, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার অর্থ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। অবশ্য প্রতিভা বল্‌লেই যে কথাটি খুবই পরিষ্কার ক'রে বলা হ'ল, তা নয়। তবে, এ-কথাটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত; আর আমাদের সবারই অল্পবিস্তর জানা আছে যে 'অপূর্ব্ব', 'অপরূপ', 'নবনবোন্মেষশালিনী', এই সমস্ত হচ্ছে এর বিশেষণ।

ইতিহাসে দেখা যায়, প্রতিভাবানেরা প্রায়ই নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি-সম্বন্ধে সজাগ। সর্ব্বসাধারণের ভিড়ে তাঁরা যে বেমালুম খাপ খেয়ে যেতে পারেন না, এ-কথাটি নিজের-মনে তাঁরা ভালো-রকমই জানেন, আর নিজেদের অন্তর্নিহিত এই সত্যকে তাঁরা পরম যত্নেই লালন করেন। 'মানসী'তে তা'র কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। (নিন্দুকের প্রতি, পরিত্যক্ত, ইত্যাদি)। তাই আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরে-শায়িত এই অসাধারণত্বকে পরম যত্নে আর পরম বেদনায় বহন ক'রে আন্‌তে-আন্‌তে শেষে পূর্ণ যৌবনে অনেকটা পূরোপূরি দেখ্‌তে পেয়েছেন, কি তা'র স্বরূপ—

> একি কৌতুক নিত্য-নূতন
>
> ওগো কৌতুকময়ী!

আমি যাহা-কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?

* * * *

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছু'টে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে-কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝি [illegible] জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

মানুষের ধর্ম্ম, সভ্যতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস সব-কিছুই এক অদ্ভুত অনুসন্ধান, —অন্ধের মতন মানুষ হাৎড়িয়ে-হাৎড়িয়ে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে চলেছে এক পথ থেকে অন্য পথে, লক্ষ্য থেকে লক্ষ্যান্তরে। বিশ্বমানবের সেই পরমরহস্যপূর্ণ বিরাট্ অনুসন্ধিৎসা এমন অল্পপরিসরে এই এসিয়ার এক-কোণের কবির অন্তরে কেমন ক'রে সজীবতা লাভ কর্‌তে পার্‌লে, সেই তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত কর্‌তে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের নেই। রবীন্দ্রনাথকে যে বিশ্বকবি * অর্থাৎ বিশ্বভাবের কবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, বাস্তবিকই তা অতিরঞ্জন নয়।

* বিশ্বকবির অন্য অর্থও আছে ; অর্থাৎ তিনিই বিশ্বকবি যিনি বিশেষ কোনো জাতি বা দেশের দুঃখ ব্যথার কবি নন। এ কথাটি কতকটা অর্থহীন। "বিশেষ"কে নিয়েই কাব্য—তার উপর 'বিশ্বে'র দ্যুতি আপনা থেকে প্রতিফলিত [illegible]। একহিসাবে সত্যকার কবি-মাত্রকেই বলা যেতে পারে বিশ্বকবি অর্থাৎ বিশ্বের কবি।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

সোনার তরী চিত্রা ও চৈতালিতে কবিপ্রতিভার এক পূর্ণ, সৌন্দর্য্যতন্ময়, আত্মপ্রকাশের পর "কল্পনা"তে দেখি—কবির নূতন চেহারা। এমন-এক অবস্থার দ্বারদেশে কবি এসে দাঁড়িয়েছেন। যার পূরো পরিচয় তিনি অবগত নন, কিন্তু পিছনে-ফে'লে-আসা ঐশ্বর্য্যের পানে চেয়ে আর তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন না।

তাঁর এই অবস্থার ছবিটি কত সুন্দরভাবে ফুটে রয়েছে কল্পনার প্রথম কবিতাটিতে।

> যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দমন্থরে,
> সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
> যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
> যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
> মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
> দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
> তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
> এখনি, অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

এই "কল্পনা"-কাব্যখানিও যে কল্পনার সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে পাঠ করা না যায় তা নয়; তবে সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা এর ভিতরকার সাধক-হৃদয়টির খবর একটু বেশী না নিয়ে পারেন না। তা-ছাড়া, সাধক-রবীন্দ্রনাথের গৌরব কবি-রবীন্দ্রনাথের গৌরবের চাইতে একটুও কম

নয়। তাই এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রম একটু বুঝতে আমরা চেষ্টা করব।

প্রথম কবিতাটি আংশিক উদ্ধৃত হয়েছে। এর "ভ্রষ্ট লগ্ন" কবিতাটি অতি বিখ্যাত। যে বিফল প্রতীক্ষার ছবি কবি এঁকেছেন কি-এক শান্ত অথচ নিবিড় বেদনা তার অন্তরে!

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
দুয়ার-সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর-গেহ
অগুরু-গন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠি পরেছি কাঁচলখানি
দূর্ব্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি'।
রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,'
বাতায়ন-তলে রয়েছি ধূলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা ব'সে গান গাহি,
"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।"

এর "ভিখারী", "বিদায়" প্রভৃতি কবিতায়ও এমনি বেদনার সুর বাজছে। কবির জীবন-যন্ত্রে যে নতুন সুর বাঁধা হচ্ছে, এ তা'রই বেদনা।

কিন্তু বেদনা-বোধই এ-কাব্যের শেষ কথা নয়। "অশেষ" কবিতায় সব বেদনা সরিয়ে রেখে কবি এক সুস্পষ্ট আহ্বান কানে শুন্‌ছেন—

মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হ'ল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
আবার আহ্বান?

তাঁর সমস্ত অবসাদ চূর্ণ ক'রে তাঁর জীবন-দেবতা বড় নির্ম্মমভাবে তাঁকে সাম্‌নে টান্‌ছেন!—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্ত-লোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চা'স হ'রে
আমার যামিনী?

এ-সব কথার সাম্‌নে শুধু কাব্যের সৌন্দর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা আপনা থেকে সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়। যে কবি-কীর্ত্তি নিয়ে সাধারণতঃ কোনো বড় কবি নিজেকে অগৌরবান্বিত মনে করবেন না, তা'রই শীর্ষে দাঁড়িয়ে ইনি বল্‌ছেন—"শেষে নিতে চাস হ'রে আমার যামিনী?"—বারবার এমন নির্ম্মম আঘাত লাভ করবার সৌভাগ্য কত অল্প লোকের জীবনে ঘটে!

কিন্তু সব-চাইতে লক্ষ্যযোগ্য এর "বর্ষশেষ" কবিতাটি। ঝড়ের বর্ণনা হিসাবেও এ-কবিতাটি সুন্দর। ঝড়ের আয়োজন তার ভ্রূকুটি তার ক্রন্দন তার উল্লাস আর শেষে তার বিরতি

অদ্ভুত ছন্দোবন্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু কবির আত্মার যে আগুন এর ভিতরে দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে, কি ছার ঝড়ের সৌন্দর্য্য তা'র কাছে! "এবার ফিরাও মোরে" প্রভৃতি কবিতায় দেখেছি, কবির অন্তরে শায়িত "মহাজীবন" সচেতন হ'য়ে উঠেছে। এই "বর্ষশেষ" কবিতায় দেখছি, তাঁর যে দ্বিধা-সঙ্কোচ ও অবসাদটুকু এখনো বাকি আছে, তা যেন ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে! যাঁর দর্শনে তাঁর এত দিনের প্রতীক্ষা অসাধারণভাবে সার্থক হয়েছে আশ্চর্য্য তাঁর রূপ! কবি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করছেন এই ভাবে :—

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।

প্রত্যেকটি বিশেষণ, প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ, এখানে যে নতুন-নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে, অভিধানে তা'র কতটুকু পাওয়া যায়! "অনুভব" যে না করতে চায়, সেই বা তা'র কতটুকু গ্রহণ করতে পারে!

কিন্তু আশ্চর্য্য এর শক্তি! একেবারে বন্ধ-হৃদয় ভিন্ন হয়ত কথাগুলো আর কারো কাছ থেকেই ব্যর্থ হ'য়ে ফি'রে যাবে না।

শেলির Ode to The West Wind-এর সঙ্গে এই কবিতাটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। দুই কবিতায়ই ঝড় প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। কিন্তু শেলি ঝড়কে বলছেন—

Be through my lips to unawkened earth
The trumpet of a prophecy!

আর রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—

লাভ-ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়

* * * *

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে ঊর্দ্ধে ল'য়ে যাও
পঙ্ক-কুণ্ড হ'তে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

"বর্ষশেষ" "বৈশাখ" প্রভৃতি কবিতায় "মহাজীবনে"র (কবির ভাষায় "বড়-আমি"র) 'তপঃক্লিষ্ট' সুষমা চোখ ভ'রে দেখে নেবার পর কবির ভবিষ্যৎ তাঁর চোখে কি চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে "রাত্রি" কবিতাটিতে তার ইঙ্গিত রয়েছে—

তোমার তিমির-তলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তা'র ধ্বজচক্রহীন
নীরব-ঘর্ঘর মহারথে।

বড় মহিমামণ্ডিত ধ্যান-গম্ভীর মূর্ত্তি কবির মনে জেগে উঠ্‌ছে—

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্দ্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি'
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি' মহাযোগী করুণাকাতর
চকিতে বিদ্যুৎ-রেখাবৎ
তোমার নিখিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তি-পথ।

তাঁর কল্পনাও কত মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে! এই রাত্রিকেই তিনি বলেছেন—

নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তি-সিংহাসনে
তোমার মহান্ জাগরণ।

বাস্তবিক রবীন্দ্র-প্রতিভার এই-এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমরা উপলব্ধি করি যে, তিনি নিজের চেতনা দিয়ে সর্ব্বমানবের পরম-সূক্ষ্ম চেতনার সঙ্গেও আত্মীয়তা কর্‌বার, আর তাঁর ললিত কণ্ঠে সে-সব প্রকাশ করবার, এক অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন। অবশ্য কবিপ্রতিভার অর্থই কতকটা তাই—বিশেষ করে গীতি-কবি-

প্রতিভার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে সেই গীতি-কবি-প্রতিভারও এক পরম অসাধারণ বিকাশই দেখ্‌তে পাই। নবীন প্রেমিক-প্রেমিকার আশা-সুখ-ব্যথা নিবিড় হ'য়েই যাঁর বাঁশীতে এক কালে বেজেছিল, তিনিই এখন বাজাচ্ছেন মহাযোগীর পরম নিগূঢ় বেদনার সুর!—আর এইই তাঁর বাঁশীর শেষ সুর নয়।

রবীন্দ্রনাথ যে কবি-শেখরের মুখে নিজের রচনা-সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার এসব জিনিষ বাঁশীর মতো—বুঝবার জন্যে নয়, বাজ্‌বার জন্যে,' তাঁর কাব্য-সম্বন্ধে এর চাইতে সুন্দর বর্ণনা আর দেওয়া যায় না। বুঝবার কথা নিশ্চয়ই তাঁর কাব্যে ঢের আছে; কিন্তু সব বোঝা, সব জ্ঞান, আনন্দ, বিষাদ, প্রেম, নৈরাশ্য, সাধনা,—এ-সমস্তের অতি ক্ষুদ্রতম কথাও, তাঁর কাব্যে কেমন বাঁশির সুরের নিবিড়তা আর অব্যর্থতা নিয়েই বাজে! "ক্ষণিকা"র সময় থেকে তাঁর এ-ক্ষমতায় যে অপূর্ব্বতা জেগেছে—গীতঝঙ্কারের অপূর্ব্বতা জেগেছে—এক হাফেজ ছাড়া আর কোনো গীতি-কবির ভিতরে সেটি প্রত্যক্ষ কর্‌বার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

কথা

"কল্পনা"য় যে সহজ প্রবল সত্যের রূপ কবির চোখ ধেঁধে দিলে, "কথা" কাব্যে দেখ্‌ছি—তা'রই সঙ্গে কবির বার-বার মুখোমুখি হচ্ছে। ভারতের পুরাণে ইতিহাসে যাঁরা জীবনের রহস্যোদ্‌ঘাটনের তপস্যা করেছেন, ক্ষুদ্র স্বার্থের কারাগারে বদ্ধ

হ'য়ে পলে-পলে যে নিদারুণ আত্মহত্যা, তা'র হাত থেকে উদ্ধার করে ক্ষতির, ত্যাগের, সময়-সময় মৃত্যুর, রাজটীকা পরিয়ে জীবনকে যাঁরা সুন্দর করেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত এক নূতন মহিমা নিয়ে কবির সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে। * অতীত তাঁর কাছে আর অতীত নয়। অতীত ইতিহাসে দীপ্যমান দেখ্‌ছেন যে "মহাজীবন" তা'রই স্পন্দন কবি নিজের ভিতরে অনুভব কর্‌তে পারছেন বলেই এর অল্প কিছু কাল পরের একটি কবিতায় অতীতকে বলতে পেরেছেন

কথা কও কথা কও।
স্তব্ধ অতীত হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—

"কথা" কাব্যখানির প্রায় সব কবিতাই সুন্দর। "প্রতি-পাদ্যে"রই মহিমা আছে; তা'র উপর লেখক অসাধারণ কুশলী। কাজেই "প্রবন্ধ" "মহত্তর" ত হবেই। রবীন্দ্রনাথের এই কাব্য-খানি বোধ হয় সব চাইতে বেশী জনপ্রিয়।

গাথা (Ballad) হিসাবে এর শেষের দিকের কবিতাগুলিই (অপমান বর, স্বামী লাভ, বন্দী বীর, নকল গড়, হোরি খেলা, বিবাহ ইত্যাদি) উৎকৃষ্ট। আর এসমস্তের মধ্যে 'হোরি খেলা' কবিতাটি অতি উঁচু দরের Ballad. Ballad-এর বিশেষত্ব তা'র সবল সরলতায়। এই জিনিষটিই এই কবিতায় পূরোপূরি দেখতে

---

*অজিত বাবুর "রবীন্দ্রনাথ" দ্রষ্টব্য।

পাওয়া যায়। আর এর ছন্দ বড় সুন্দর—ঘোড়ার হোরি খেলার ছন্দই বটে।

পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁরে
    কেতুন হ'তে ভুনাগ রাজার রাণী,—
লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এস তোমার পাঠান সৈন্ত নিয়া—
    হোরি খেল্‌ব আমরা রাজপুতানী।
যুদ্ধে হারি' কোটা-সহর ছাড়ি'
    কেতুন হতে পত্র দিল রাণী।

কিন্তু 'কথার' পরিশোধ কবিতাটিই হয়ত এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা—রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের অন্যতম। এই কবিতা সংস্পর্শে নীতির কথা কেউ তুল্‌লে আশ্চর্য্য হবো না; এর বিশেষত্বও সেইখানেই। কবি-দৃষ্টি যে কি অসাধারণ, প্রায় সর্ব্বভেদী, প্রচলিত নীতি-রুচি মত-বিশ্বাস ইত্যাদির স্থূলতা সে দৃষ্টির সাম্‌নে যে কেমন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, সত্য আপনার উলঙ্গ মহিমায় সুপ্রকট হয়, এ কবিতাটিতে তার আশ্চর্য্য পরিচয় রয়েছে। এর যে-জায়গায় শ্যামা বল্‌ছে—

……বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজ স্কন্ধে লয়ে

দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্ব্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্ব্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি' এ মোর গৌরব।—

সেখানে বজ্রসেন যদি—

কি কহিলি পাপিয়সী.........
.........চাহি না আর তোরে

বলে' নাটকীয় ভঙ্গিতে পদাঘাত করে চলে যেত আর সেখানেই যবনিকা পতন হ'ত, তা'হলে এক শ্রেণীর সমঝদারদের কাছ থেকে হয়ত হাততালির আর অন্ত থাকৃত না। কিন্তু কবির প্রাণপুরুষ লজ্জার দুরূহ ভারে পিষ্ট হ'য়ে যেত।—স্থূলদৃষ্টি যে সেই কেবল জানে, পাপ আর পুণ্য দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। দৃষ্টিমান্ প্রত্যক্ষ করে, ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য সমস্তের ভিতর দিয়ে চলেছে মানুষেরই জয়যাত্রা। সে যাত্রা-পথে, মোহ-দুর্ব্বলতার সহস্র কুশাঙ্কুরে নিত্য বিদ্ধ মানুষের [redacted]; মানুষের সে-বেদনা পরম দরদী কবি যদি না বুঝ্‌বেন তবে আর বুঝ্‌বে কে?*

ক্ষণিকা

"কল্পনা"য় কবি-হৃদয়ের যে-বেদনা উপলব্ধি করেছি, 'কথা'র মহাজনদের অমৃতস্পর্শ লাভ ক'রেও কবির অন্তরের সে বেদনা প্রশমিত হয়ে যায়নি। কিন্তু এই ক্ষণিকা কাব্যে সে-বেদনা

*Dante-এর Divine Comedy-র Francesca [redacted] Paolo-র অতি [redacted] কাহিনী এই সম্পর্কে স্মরণীয়।

রয়েছে নীচে। সেই ব্যথার মৃণালের উপর তাঁর প্রতিভাপদ্ম যে-ভাবে পাপড়ি খুলে দাঁড়িয়েছে অপূর্ব্ব তার সৌন্দর্য্য আর সৌরভ। ব্যথা, বিবেচনা, সমস্যা, সন্ধান—সব সরিয়ে দিয়ে ক্ষণ-প্রকাশের বুকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে-অমৃত ফুটে উঠছে কবি তাই চোখ ভ'রে দেখ্‌ছেন, আর প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন—

ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি!
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি!
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নেরে বুকে,
আজিকার মতো যাক্ যাক্ চু'কে
যত অসাধ্য সাধনি!
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি!

প্রকাশ-ভঙ্গিমা কত শাণিত!—এপর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যত কাব্য লিখেছেন তা'র মধ্যে নিছক গীতিকবিতা হিসাবে এই ক্ষণিকার কবিতাগুলি আমাদের কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। [redacted] চটুল ভঙ্গীতে কবি কথা বল্‌ছেন, অথচ তা'রই ফাঁকে-ফাঁকে কবি-হৃদয়ের অন্তস্তলে চেয়ে দেখবার সুযোগ আমাদের যখন ঘট্‌ছে তখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কি গভীরতা থেকে তাঁর কথা উৎসারিত, আর অনেক সময়েই কেমন বেদনাভরা সেই গভীরতা।

ওমর খৈয়ামের সঙ্গে এখানে রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে। তবে ওমরের মতো জীবনের অতি গুরুতর সমস্যাগুলোর কোনো মীমাংসা করতে না পেরে "ভাগ্য-দেবীর ক্রূর পরিহাস পেয়ালা ভ'রে ভুলবার" চেষ্টাই এখানে কবির সবখানি কথা নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-ভঙ্গিমার বেশী মিল বরং হাফেজের সঙ্গে।

ক্ষণিকার বহু পরে শিশু ভোলানাথ প্রভৃতি কাব্যে কবির "সহজে"র সাধনা পূরোপূরিই আমরা দেখ্‌তে পাই। এই ক্ষণিকায় তার'ই পূর্ব্বসূচনা। সত্যকে সব বাহুল্যের আবর্জ্জনা থেকে মুক্ত করে এমন সহজরূপে প্রকাশ করবার ক্ষমতা এর আগে রবীন্দ্রনাথে দেখা যায়নি। কণিকায় এর সামান্য আভাস আছে; কিন্তু ক্ষণিকায় সহজ সুন্দরের লীলা যে ভাবে দলের পর দলে খুলে যেতে চাচ্ছে, বাস্তবিকই তা অপূর্ব্ব। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনায়ও কবির এই [redacted] ভঙ্গী—

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জ্জনে
চখাচখির ঘর।
যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে
দু'একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধেবেলায় ভিড়ে।

ক্ষণিকার 'মাতাল' কবিতাটি বিখ্যাত। জীবনের সব জটিলতা, দুর্ভাবনা, সরিয়ে দিয়ে হৃদয়াবেগের সহজ পথে চলার যে সত্য কবির চোখে ফুটে উঠ্‌তে চাচ্ছে, তাই-ই ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে এই কবিতায়—

পাড়ার যত জ্ঞানী গুণীর সাথে
নষ্ট হ'ল দিনের পর দিন,
অনেক শিখে পক্ক হ'ল মাথা,
অনেক দেখে দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ,
কত কালের কত মন্দ ভালো
ব'সে ব'সে কেবল জমা করি,
ফেলা-ছড়া ভাঙা-চোরার বোঝা
বুকের মাঝে উঠছে ভরি' ভরি',
গুঁড়িয়ে সে-সব উড়িয়ে ফেলে দিক্
দিক্-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া!
বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ
মাতাল হ'য়ে পাতাল পানে ধাওয়া! ■

■ মা দর পিয়ালে আক্‌সে রোখে ইয়ার দিদায়েম। আয় বেখবর [illegible] শুর্বে মুদামে মা॥ হাফেজ। আমাদের নিরন্তর-পান-সুখে ওগো বঞ্চিত, শোনো, আমরা আমাদের পেয়ালার ভিতরে প্রিয়তমের মুখ প্রতিবিম্বিত দেখেছি।

যুগল কবিতাটিতে [redacted] সন্ধান কি অব্যর্থ! জায়গায় জায়গায় Browning-এর The Last Ride Together মনে করিয়ে দেয়—

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মান্‌ব নাক রাজার দারোগারে,—
কেল্লা হ'তে ফৌজ সারে সারে
দাঁড়ায় যদি শুঁচায় ছোরাছুরি,
বল্‌ব, রে ভাই, বেজার কোরো নাকো,
গোল হতেছে একটু থেমে থাকো,
কৃপাণ-খোলা শিশুর খেলা রাখো
ক্ষ্যাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি!
একটুখানি সরে' গিয়ে করো
সঙের মতো সঙীন্ ঝমঝমর,
আজকে শুধু একবেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর!

হৃদয়ের আবেগ যে অসত্য নয়, সৌন্দর্য্যের উপলব্ধির যে কোন সত্যের কাছেই মাথা হেঁট করবার প্রয়োজন করে না 'অতিবাদ' কবিতাটিতে কত স্বচ্ছন্দচিত্তে কবি সে কথা বল্‌তে পার্‌ছেন—

আজ [redacted] বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইক পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে,

*   *   *

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ কর্‌চে বিরাজ
সকল প্রকার অজস্রত্ব!
কেন রাখ্‌ব কথার ওজন?
কৃপণতায় কোন্ প্রয়োজন?
ছুটুক বাণী যোজন যোজন
উড়িয়ে দিয়ে যত্ব ণত্ব!

হাফেজের দিউয়ান যাঁদের প্রিয় তাঁরা 'ক্ষণিকা'র এইরকম বহু কবিতায় তা'র ঝঙ্কার অনুভব কর্‌বেন। কিন্তু দুয়ের পার্থক্যও লক্ষ্য কর্‌বার যোগ্য। মিলনের যে সৌন্দর্য্য, আবেগ, আনন্দ, তাই দিউয়ানের স্থায়ী ভাব। ক্ষণিকায়ও মাঝে মাঝে এসব চিকমিক ক'রে ওঠে। কিন্তু একে অপূর্ব্ব করেছে, এর সব সৌন্দর্য্য-বোধ, আবেগ, আর স্ফূর্ত্তির তলদেশে লুকায়িত যে বেদনা। কতকগুলো কবিতায় দেখা যাচ্ছে, কবি সে-বেদনা আর লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছেন না—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাস্‌বি কি না
বুঝ্‌ব কেমন ক'রে?
আপনি হেসে তাই

শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
ঠাট্টা ক'রে ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই।
হাল্‌কা তুমি করো পাছে
হাল্‌কা করি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

আর পরামর্শ কবিতায় কবির অশ্রু যেন আর রোধ মান্‌তে চাচ্ছে না।—

অনেক বার ত হাল ভেঙেছে,
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে,
ওরে দুঃসাহসী !
সিন্ধু পানে গেছিস্ ভেসে
অকূল কালো নীরে—
ছিন্ন রসারসি।
এখন কি আর আছে সে বল ?
বুকের তলা তোর
ভরে উঠ্‌ছে জলে।
অশ্রু সেঁচে চলবি কত
আপন ভারে ভোর
তলিয়ে যাবি তলে।

কবি নিজেকে সমঝাচ্ছেন, এখন না হয় তরী ঘাটেই বাঁধা থাকুক, আর কাজ কি দুঃসাহসে ভর করে নতুন যাত্রা করা ?

এবার তবে ক্ষান্ত হ'রে
ওরে শ্রান্ত তরী।
রাখ্‌রে আনাগোনা!
বর্ষ-শেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যা গগন ভরি'
ঐ যেতেছে শোনা।

কিন্তু মিছে প্রবোধ দেওয়া—

হায়রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধ'রে বসেছে তা'র
যমদূতের সম
স্বভাব সর্ব্বনেশে।
ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশা
ছাড়্‌বে নাকো আর,
হায় রে মরণ-লুব্ধী।
ঘাটে সে কি রৈবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকা-ডুবি।

এর সঙ্গে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতা মিলিয়ে পড়লে এর বিশিষ্টতা সহজেই অনুভব করা যায়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রয়েছে দূর থেকে কবি যে মৃত্যুভীষণ মহাজীবনের কল্লোল শুন্‌তে পেয়েছেন তারই ছন্দ। তাই বলেছি, এ তাঁর

প্রতিভা-নির্ঝরের আর-এক স্বপ্নভঙ্গ। কিন্তু সে জীবন-পথে বহু দূর এগিয়ে কবি যে বিষম "আকর্ষণ" অনুভব করছেন, সেই সর্ব্বনাশা আকর্ষণের টানে সামনে চল্‌তে যে অদ্ভুত আশঙ্কা ও বেদনা কবির চিত্তে জাগছে, তারই অপরূপ ছবি ফুটে উঠেছে এই কবিতায়! হাফেজও বলেছেন,

> ...ইশ্‌ক্ আসান নমুদ আউয়ল
> ওালে উফ্‌তাদা মোশ্‌কেল্ হা।*
>
> শবে তারীখ ও বীমে মওজ
> ও গির্‌দ আবে চনিন হায়েল।
> কুজা দানন্দ হালে মা
> সুবুক্ সারানে সাহিল হা। †

কবির প্রেম সাধনার এখন কি অবস্থা তার নির্দ্দেশ রয়েছে এর শেষের দিকের "অন্তরতম" কবিতায়—

> আমি যে তোমায় জানি, সে ত কেউ
> জানে না।
> তুমি মোর পানে চাও, সে ত কেউ
> মানে না।

---

* প্রথমে প্রেম বড় আরামের মনে হয়েছিল, কিন্তু শেষে দেখ্‌ছি মুশ্‌কিল এসে পৌঁছেছে।

† অন্ধকার রাত, উর্ম্মিসংঘাত, ঘূর্ণাবর্ত্তও তুমুল গর্জ্জে,
বেলায় বাস যার বুঝবে ছাই তার পথের ক্লেশ মোর সমুদ্দর যে।
—কবি [redacted] ইসলামের অনুবাদ।

মোর মুখে পেয়ে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,
কেহ কিছু নারে কহিতে।

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে কথা বলিনে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে।

প্রভাত না হতে কখন আবার
গৃহ-কোণ মাঝে আসিয়া,
বাতায়নে বসে বিহ্বল বীণা
বিজনে বাজাই হাসিয়া।
পথ দিয়া যেবা আসে যেবা যায়
সহসা থমকি চমকিয়া চায়,
মনে করে তারে ডেকেছি।
জানে না ত কেহ কত নাম দিয়ে
এক নামখানি ঢেকেছি।

বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, পূর্ব্বরাগের পালা শেষ, কবির চিত্ত এখন অনুরাগের রাঙা রাখীতে বাঁধা পড়ে' গেছে।

এ ভিন্ন [illegible] ধরণের কবিতাও ক্ষণিকায় আছে, আর কবির অভিনব বর্ণন-ভঙ্গীতে তারও অধিকাংশই সুন্দর কবিতা। এর বর্ষার কবিতাগুলি খুবই চমৎকার। বর্ষার অনেক সুন্দর কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। তার মধ্যেও মানসী, সোনার তরী, আর ক্ষণিকার, বর্ষার কবিতা লক্ষ্যযোগ্য। বাস্তবিকই যেন কাজল মেঘের ছায়া পড়েছে এইসব কবিতার উপর। আর তাই তাদের চেহারায় কেমন তৃণপল্লবেরই নবীনতা।

ওগো আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে
আকাশ আঁধার বেলা বেশী আর নাহিরে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথ পানে দেখ্‌ চাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।

ক্ষণিকার "নববর্ষা" কবিতাটি খুবই বিখ্যাত। এর সে খ্যাতি কোনোদিন যে ম্লান হবে তা মনে হয় না। Nightingale-এর গান শুনে যে আনন্দে Keats বলেছিলেন, My heart aches সেই অবশ-করা আনন্দের অনুভূতি রয়েছে এর ভিতরে; আর

সেই আনন্দের গুরু ভারে ছন্দ বোঝাই নৌকার মতো কেমন ধিমিয়ে ধিমিয়ে চলেছে—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচেরে।
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে।

এর ক্ষতিপূরণ, প্রতিজ্ঞা, পথে, কবি, সোজাসুজি, একগাঁয়ে প্রভৃতি খুবই লক্ষ্যযোগ্য কবিতা। কবির সহজের সাধনার কথা আগেই বলা হয়েছে ; [redacted] গভীর আর জটিল কথাও সহজ

আর চটুল ভঙ্গিতে কবি প্রকাশ করতে পারেন এসবে তারই প্রচুর পরিচয় রয়েছে। বেশ হাল্‌কা ভাবেও এগুলো পড়া যেতে পারে; কিন্তু কবির দিকে একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে চাইলেই বুঝতে পারা যায়, স্ফূর্ত্তিবাজ তাঁকে যতই মনে হোক, আসলে, সোজা পাত্র তিনি নন—

আমি নাবব্ মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি'
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায়-কণায়।

বাস্তবিক কবির দৃষ্টি এখন কত তীক্ষ্ণ, আর কত প্রসারিত তাঁর হৃদয়, তা'র সুন্দর পরিচয় আমরা পাই এর "কবির বয়স" কবিতাটিতে—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন?

পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক্-বয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি,
কারো হাসি আঁখির কোণে-কোণে,
কারো অশ্রু উছ্‌লে পড়ে' যায়,
কারো অশ্রু শুকায় মনে-মনে ;—
কেউবা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে,
জগৎ-মাঝে কেউবা হাঁকায় রথ,
কেউবা মরে একলা ঘরের শোকে,
জনারণ্যে কেউবা হারায় পথ।
সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমান-বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক পাক।

নৈবেদ্য

কল্পনায় ও ক্ষণিকায় কবির ভিতরে যে নবজন্ম-সঞ্চারের বেদনা উপলব্ধি করেছি, নৈবেদ্যে দেখা যাচ্ছে, সে-বেদনা কেমন একটু সার্থক হ'য়ে দেখা দিয়েছে স্পষ্টতর দৃষ্টিতে। কবি উপলব্ধি কর্‌ছেন, সারাজীবন তিনি যে-ভাবে কাটিয়ে এসেছেন, যে-সব অনুভূতির ভিতর দিয়ে এসেছেন, তা'র কিছুই বৃথা নয়, মিথ্যা নয়। সেই সমস্তেরই সঙ্গে-সঙ্গে অপরূপও তাঁর ঘরে বহু বার প্রবেশ করেছেন—

নির্জ্জন শয়ন-মাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গত জীবনের কত কথা। হেন ক্ষণে
শুনিলাম, তুমি কহিতেছ মোর মনে ;—
ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্ম-ভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা,
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখ শোক,
যত ভালো মন্দ, যত গীতগন্ধ ল'য়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি'।
দ্বার রুধি' জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।

নৈবেদ্যের প্রথমে কতকগুলি প্রার্থনা-সঙ্গীত রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনার জন্য প্রয়োজন যে স্থির চিত্তের আর স্থির লক্ষ্যের রবীন্দ্র-প্রতিভায় এখন সেটি সম্ভবপর হয়েছে। এই প্রার্থনার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে কবি অনুভব করছেন, জাগ্রত আত্মার ভার বহন করা কত আয়াসসাধ্য! অথচ এ ভার বহনের প্রতি তাঁর পরম লোভ!—

তোমার পতাকা যারে দাও, তা'রে
বহিবারে দাও শকতি।

তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি !
দুখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি।

কিন্তু এ ভার-বোধ শেষে আর থাকছে না। আত্মার অপরূপ জ্যোতিই তাঁকে চমৎকৃত করছে—

দেহে আর মনে-প্রাণে হ'য়ে একাকার
এ কি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার !
এ কি জ্যোতি ! এ কি ব্যোম্ দীপ্ত দীপ-জ্বালা
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা !
এ কি শ্যাম বসুন্ধরা সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্ব্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার ! এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ !
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।

তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন

অসীম বিচিত্র কান্ত ! ওগো বিশ্বভূপ,
দেহ মনে প্রাণে আমি এ কি অপরূপ ?

এই নৈবেদ্য কাব্যখানিতে বেশী ক'রে চোখে পড়ে কবির যোগীর ভাব—পরম মঙ্গলময়ের প্রতি তাঁর চিত্ত সব সময়ে উন্মুখ হ'য়ে আছে। তাঁর এ যোগ যেন কিছুতেই ভাঙে না—

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্দ্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন-সনে ;
আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি ব'হে ল'য়ে
ফিরি' আসিলাম যবে নিভৃত আলয়ে
দাঁড়াইনু আঁধার অঙ্গনে। শীতবায়
বুলাল স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গায়
মুহূর্ত্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া।
মুহূর্ত্তেই মৌন হ'ল স্তব্ধ হ'ল হিয়া
নির্ব্বাণপ্রদীপ রিক্ত নাট্যশালা সম।
চাহিয়া দেখিনু উর্দ্ধপানে ; চিত্ত মম
মুহূর্ত্তেই পার হ'য়ে অসীম রজনী
দাঁড়াল নক্ষত্রলোকে। হেরিনু তখনি—
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

এই পরম সমাহিতচিত্ততার অবস্থায় এমন অনেক কথা তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রের মতনই যা পূর্ণ আর অগ্নিগর্ভ। নৈবেদ্যের—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'

—এমনই এক বাণী—বিশ্বমানবের কানে (বিশেষ করে' তাঁর অস্বাভাবিকতা-পীড়িত স্বদেশীয়দের কানে) এক বড় মন্ত্র।

এই মন্ত্রটি তাঁর সাধনার ধারার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁর সমগ্র জীবনকে দু'ভাগ ক'রে দেখাচ্ছে। একদিকে অসংখ্য বন্ধন-মাঝে যে মুক্তির আনন্দ প্রচ্ছন্ন রয়েছে রবীন্দ্রনাথকে বারে-বারে ঘু'রে-ফি'রে নানা পাকে বদ্ধ হ'তে দে'খে আর সে-সব বন্ধন এড়িয়ে যেতে দে'খে সে-কথার যোগ্য প্রমাণ আমরা পাই। অন্যদিকে গীতালিতে এই সত্যটি আরো গভীর ক'রে উপলব্ধি কর্‌বার পর বলাকা পলাতকা প্রভৃতি কাব্যে দেখতে পাই, দৃষ্টির অব্যর্থতা নিয়ে আনন্দময় কবি যেন স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন।

ভারত সম্বন্ধে সে-সমস্ত কবিতা এতে আছে, সে-সমস্তও এম্‌নি পূর্ণ আর বীর্য্যবান দৃষ্টির আলোকে ভাস্বর। ভারতের অতীত মহিমা, বর্ত্তমান হীনতা দীনতা, আর ভবিষ্যতের লক্ষ্য, সমস্তই তাঁর যোগ-দৃষ্টিতে তিনি যেন মধ্যদিনের-আলোকে-দেখা চিত্রের মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।—

তাঁহারা দেখিয়াছেন—বিশ্বচরাচর
ঝরিছে আনন্দ হ'তে আনন্দ নির্ঝর;
অগ্নির প্রত্যেক শিখা [redacted] তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারই প্রতাপে,

তোমারি আদেশ বহি' মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্ম্মরিয়া [redacted] যাতায়াত ;

*　　*　　*

*　　*　　*

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ-ভার,
এই চির পেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে-পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্য্যাদাগর্ব্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি' দূর করো !

*　　*　　*

*　　*　　*

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি'
হে ভারত সর্ব্বদুঃখে রহ তুমি জাগি'
সরলনির্ম্মল চিত্ত ; সকল বন্ধনে
আত্মারে স্বাধীন রাখি' পুষ্প ও চন্দনে
আপনার অন্তরের মাহাত্ম্য-মন্দির
সজ্জিত সুগন্ধি করি' দুঃখনম্রশির

তাঁর পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে !
তাঁ'হতে বঞ্চিত করে তোমায় এ-ভবে
এমন কেহই নাই—সেই গর্ব্বভরে
সর্ব্ব ভয়ে থাকো তুমি নির্ভয় অন্তরে
তাঁর হস্ত হতে ল'য়ে অক্ষয় সম্মান।
ধরায় হোক না তব যত নিম্ন স্থান
তাঁর পাদপীঠ করো সে আসন তব
যাঁর পাদরেণুকণা এ নিখিল ভব।

আরো লক্ষ্যের বিষয় এই যে, কবি এখানে মঙ্গলময় ঈশ্বরকে অন্তরে-অন্তরে অনুভব ক'রেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। তাঁকেই তাঁর চিত্তমন্দিরে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁরই সৈনিকরূপে সংসার-বক্ষে দৃঢ়পাদক্ষেপে বিচরণ করতে চাচ্ছেন—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে ! যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে ! যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজ স্থান !
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

বাস্তবিক ক্লৈব্যবিবর্জ্জিত এক অসাধারণ বলীয়ান আত্মার সাক্ষাৎই আমরা এই নৈবেদ্য কাব্যের প্রায় সব জায়গায় পাই।

আর এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যকে আমরা তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম বলে' জ্ঞান করি। কাব্যের উৎকর্ষ সৃষ্টিতে; আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক ওজস্বল জাগ্রত আত্মা সেই সৃষ্টি-মহিমা লাভ করেছে এই কাব্যে।

নৈবেদ্য কাব্যখানি মুসলমান-পাঠকের কাছে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ; মঙ্গলের অভিমুখে এমন ক্লৈব্যবিবর্জ্জিত অগ্রগতিই কোর্‌আনের ইস্‌লামের প্রিয়।

ভাববিলাসী বাঙালীর নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিত এই কাব্য—

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তিমদ-ধারা
নাহি চাহি নাথ!
দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি' মঙ্গল কলস
সংসার-ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর—সর্ব্ব কর্ম্মে দিবে বল,
ব্যর্থ [redacted] চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন।

সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।

কিন্তু [redacted] শেষের দিকের দুটি প্রার্থনায় (৮৬,৮৭) দেখ্‌তে পাচ্ছি, আর এক সুর বাজ্‌ছে কবির চিত্তবীণায়। ধ্যান তাঁর হৃদয়ে চমৎকার উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে; তবু অন্তরের শুষ্কতা তাঁর ঘুচছে না। সে উজ্জ্বলতা সময়ে যেন তাঁর পক্ষে "নিঃশব্দ দাহ"। তাই কবি প্রার্থনা কর্‌ছেন—

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি' বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্দ্ধপানে চাহি'। ওহে নাথ,
এ রুদ্র মধ্যাহ্ন মাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্ দূর হ'তে এসে
ব্যগ্র শাখা প্রশাখায় চক্ষের নিমিষে
কানে-কানে রটাইবে আনন্দমর্ম্মর,
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বন বনান্তর!

এত ধ্যান-জ্ঞানের অন্তরে অন্তরে এই প্রতীক্ষার ব্যথা!—তপস্যার রুদ্র দহন প্রেমের বর্ষণই চায়।—বিধাতার অসাধারণ কৃপা এই কবির উপর।

আমাদের মনে হয়, নানা সংস্কার-জর্জ্জরিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহনের যে প্রতিবাদ আর মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথে প্রতিফলিত বাঙালী-জীবনের যে নব ঈশপ্রাণতা, বাংলা

সাহিত্যে তার এক বড় সার্থকতা লাভ হয়েছে এই নৈবেদ্য কাব্যে।

নৈবেদ্য প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। এই ঘটনাও হয়ত নিরর্থক নয়—

শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী! দয়াহীনা সভ্যতা নাগিনী
তুলিছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে,
গুপ্ত বিষ দন্ত তা'র ভরি তীব্র বিষে।

আর বিংশ-শতাব্দীর এই প্রারম্ভকে সাম্‌নে ক'রে ভারতের এক প্রান্তে এক জাগ্রত-আত্মা কবি প্রার্থনা করছেন—

......বীর্য্য দেহ, ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান,—বলের চরণে
না লুটিতে; বীর্য্য দেহ, চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে দিতে রাখি'।
বীর্য্য দেহ তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

শিশু

নৈবেদ্যের কিছুদিন পরে শিশু-কাব্য প্রকাশিত হয়। এই শিশুকাব্যের জন্মবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে অজিত-বাবু বলেন, পীড়িতা কন্যা

মাতৃহীন শিশু-পুত্র শমী কবির কাছে পিতার এবং মাতার উভয়েরই স্নেহ লাভ করত। সেই গভীর স্নেহ থেকে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্য রসে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

শিশুকাব্য রবীন্দ্র-প্রতিভার এক অসাধারণ নিদর্শন সন্দেহ নাই। অজিতবাবু যে বলেছেন, এ সেই বৈষ্ণব মাধুর্য্যতত্ত্ব, ভগবানকে যারা বাৎসল্যরসের ভিতর দিয়ে দেখে তাদের সেই মাধুর্য্যের স্রোতটি এর মধ্যে আগাগোড়া প্রবাহিত, সে-কথাটি অনেক পরিমাণে সত্য। অনেকপরিমাণে বল্‌ছি এই শিশু-কাব্যের বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে। বৈষ্ণব-সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে তিনি ভগবান্‌কে লাভ ক'রে শিশুতে তাঁর প্রকাশের আনন্দ উপলব্ধি করেন; অথবা গুরুর কাছ থেকে এ তত্ত্বের সন্ধান পেয়ে নিজের জীবনে তা প্রতিফলিত দেখতে প্রয়াস পান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় দেখা যাচ্ছে, ভগবৎ-সাধনায়ও নিজের অন্তরের অনুভূতি আর সন্ধানের প্রদীপ তাঁকে পথ দেখাচ্ছে। তাই এ কাব্যে মাধুর্য্য-রসের সঙ্গে-সঙ্গে মিশে' রয়েছে এক রহস্য-রস। কিন্তু তাতে কাব্য-হিসাবে এর গৌরব বেড়েছে বৈ কমেনি; কেননা আধুনিকের সাম্‌নে প্রসারিত যে জগৎক্ষেত্র তা বহুল পরিমাণে বিরাটতর, আর সেই অসীমবৈচিত্র্য-পূর্ণ বিরাট জগৎ-ক্ষেত্রের উপর ক্ষুদ্র শিশু পরম রহস্যপূর্ণই বটে।—

জগৎ-পরাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।

অন্তহীন গগনতল
মাথার পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কি কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা।

এই কাব্যে কবি যেন তাঁর ভগবৎ-উপলব্ধির দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে শিশুতে তাঁর কেমন-এক ছটা প্রত্যক্ষ কর্‌ছেন—যেন প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ গাছের পাতা-ফেঁক্‌ড়ির ফাঁকে-ফাঁকে তীক্ষ্ণ হ'য়ে এসে চোখে পড়্‌ছে।

আগেকার ক্ষণিকার মধ্যে যে সহজ প্রকাশ-ভঙ্গিমা তার সঙ্গেও এর তফাৎ রয়েছে। ক্ষণিকার মধ্যে যে সহজ প্রকাশের লীলা জীবনানন্দেরই এক বিচিত্র ভঙ্গিমা—ভগবৎ-অন্বেষণ তার তলে তলে লুকিয়ে রয়েছে ব'লে এই বিচিত্রতা। কিন্তু 'শিশু'র ভিতরে ভগবৎ-দীপ্তি যেন কতকটা সোজাসুজি কবির চোখে-মুখে এসে পড়্‌তে চাচ্ছে। তাই কবির কথাগুলো খুব সোজা আর মধুর, কিন্তু তা'রই সঙ্গে-সঙ্গে বাজছে কেমন এক অপরূপ সন্ধানের সুর—

রঙীন্ খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে, বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে জলে রং ওঠে' জেগে,

কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।

*　　*　　*　　*

যখন নবনী দিই লোলুপ করে,
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে।

'সমব্যথী' কবিতায় বালকের সহজ খেয়ালের অন্তরে কবির মনের কি এক তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা!—

যদি　　খোকা না হ'য়ে
আমি　　হতেম কুকুরছানা—
তবে,　　পাছে তোমার পাতে
আমি　　মুখ দিতে চাই ভাতে
তুমি　　কর্‌তে আমায় মানা?
　　সত্যি ক'রে বল্‌
আমায়　　করিস্‌ নে মা ছল,
　　বল্‌তে আমায় "দূর দূর দূর দূর!"
　　কোথা থেকে এল এই কুকুর?
　　যা' মা তবে যা' মা,
আমায়　　কোলের থেকে নামা!
আমি　　খাবো না তোর হাতে,
আমি　　খাবো না তোর পাতে!

যদি খোকা না হ'য়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে,
তবে পাছে যাই মা উড়ে
আমায় রাখ্‌তে শিকল দিয়ে ?
সত্যি ক'রে বল্‌
আমায় করিস্‌ নে মা ছল—
বল্‌তে আমায় হতভাগা পাখী
শিকল কেটে দিতে চায়রে ফাঁকি !

এর কতকগুলো কবিতায় বাৎসল্যরস জমাট হ'য়ে দেখা দিয়েছে—

তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া ?
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙীন্‌ আঙিয়া !
বিহান বেলা আঙিনা-তলে
এসেছ তুমি কি খেলা-ছলে
চরণ-দুটি চলিতে ছুটি'
পড়িছে ভাঙিয়া।
তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া ?

* * *

* * *

বাছারে তোর সবাই ধরে দোষ !
আমি দেখি সকল তা'তে

এদের অসন্তোষ !

খেল্‌তে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে,
তাই কি বলে লক্ষীছাড়া ছেলে ?
ছি ছি কেমন ধারা !
ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে
সে কি লক্ষীছাড়া ?

আর এর কতকগুলি কবিতা অতি সুন্দর ছড়া—ছোটো-বড়, বীরপুরুষ, বলবান্, ইত্যাদি। সমস্ত শিশুকাব্যখানির ভিতরে একটি তাজা, চিরনবীন, রহস্যের সংস্পর্শে চিরচঞ্চল, প্রাণ ঝলমল কর্‌ছে !

রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্যের কথা ভাবলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হ'তে হয়—চিরদিনই হয়ত সাহিত্যানুরাগীরা এই কথাটি ভেবে চমৎকৃত হবেন।

খেয়া

এর কিছুদিন পরে স্বদেশী আন্দোলনের দিনে রবীন্দ্রনাথকে একজন অগ্রণীরূপে দেখতে পাওয়া যায়। নৈবেদ্যে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যভাবে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রার্থনা করেছেন,—

কর মোরে সম্মানিত নব বীর-বেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্য-ভারে, দুঃসহ কঠোর

বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি' নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে ক'রে দাও সক্ষম স্বাধীন…,

স্বদেশী আন্দোলনের দিনে তিনি যে কর্ম্মব্রত নিয়েছিলেন তার উদ্‌যাপনে তাঁর ভিতরে এতটুকু দ্বিধা দেখা যায়নি। সঙ্গীত, বক্তৃতা, আদর্শপ্রচার, ইত্যাদির দ্বারা সে-আন্দোলনকে তিনি আরো বহুগুণে আন্দোলিত ক'রে তুলেছিলেন।

কিন্তু শেষে দেখা গেল, এ-আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন। এর জন্য তাঁর অনেক ভক্তও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই কাজ উচিত হয়েছিল কি অনুচিত হয়েছিল, সে-আলোচনা অনেকটা নিরর্থক। ইতিহাস যে-ভাবে গ'ড়ে উঠছে, সেই-ভাবেই তা'কে গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায় কি আছে। কিন্তু এই যুগের রবীন্দ্রসাহিত্য একটু ভালো ক'রে প'ড়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়, যে স্ব-ধর্ম্মের সন্ধান কবি আজীবন ক'রে আস্‌ছেন, নিজেকে শেষে স্বদেশী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সেই স্ব-ধর্ম্মপালনই তিনি করেছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি যে-আদর্শ থেকে স্বদেশ-মঙ্গলের কথা বল্‌ছিলেন, স্বাদেশিকতা তার শেষ পর্য্যায়ে তা থেকে ভিন্ন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ, এক গভীর আধ্যাত্মিক বোধের জন্য

সমস্ত কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে তিনি বড় পীড়ন অনুভব কর্‌ছিলেন। সাধকের যে শান্ত সমাধি, ভক্তের যে সঙ্গোপনের পূজা, এই সমস্তেরই তাঁর বড় প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছিল। এ'কেই লক্ষ্য ক'রে কবি বলেছেন *—

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি ত আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলি' গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।

অনেক দূরে এলেম সাথে-সাথে,
চলেছিলেম সবাই হাতে-হাতে,
এইখানেতে ছুটি পথের মোড়ে
হিয়া আমার উঠল কেমন ক'রে
জানিনে কোন্ ফুলের গন্ধ ঘোরে
সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে।
আর ত চলা হয় না সাথে-সাথে।

ক্ষণিকায় দেখেছি, কবির চিত্তে পরম-সুন্দরের প্রতি অনুরাগ জেগে উঠেছে। নৈবেদ্যে দেখেছি, তিনি যে তাঁরই এ প্রত্যয় কবির ভিতরে দৃঢ় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত

* অজিতবাবুর "রবীন্দ্রনাথ" দ্রষ্টব্য।

ভক্তভাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি খেয়াতে। অনুরাগ আর বিশ্বাসেই তিনি সন্তুষ্ট থাক্‌তে পার্‌ছেন না—"প্রতীক্ষা" তাঁর ভিতরে নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। সেই প্রতীক্ষার ব্যথায় কবি এক নূতন ভঙ্গিতে কথা বল্‌ছেন।—

আমার যে এই নূতন গড়া
নূতন-বাঁধা তার
নূতন সুরে কর্‌তে সে যায়
সৃষ্টি আপনার।
মেশে না তাই চারিদিকের
সহজ সমীরণে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
স্তব্ধ আলোর সনে।
জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে,
যত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে।
ঘটিয়ে তুলি কত কি যে
বুঝি না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অনায়াসে
হয় না সুরের মিল।

বেশীর ভাগ কথা কবি রূপক দিয়ে বল্‌ছেন। এর এক কবিতায় বালিকা-বধূর এক সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে। কিন্তু

সেটি হয়ত শুধু বালিকা-বধূর ছবিই নয়। কবি অনুভব করছেন, সেই বিরাটের পাশে তাঁর নিজের চিত্তও এম্‌নি বালিকা বধূর মতনই দাঁড়িয়ে। তিনি যে কত বড়, কি যে তাঁর মহিমা, অবোধ বালিকারই মতন কবি-হৃদয় সেই তত্ত্বের রস-বিলাসের সন্ধান পূরোপূরি পায়নি ; তবু তাঁর সঙ্গে কবির যে কেমন-একটি নিবিড় যোগ স্থাপিত হয়েছে এ-কথাটি বাঁশির সুরের অনির্ব্বচনীয়তা নিয়েই বেজে উঠেছে !—

ওগো বর, ও গো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তা'র
খেলিবার ধন শুধু ;
ওগো বর ওগো বঁধু।

* * * *

শুধু দুর্দ্দিনে ঝড়ে
—দশ দিক ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাতলে অম্বরে—
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধূলা কোথা প'ড়ে থাকে তা'র
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,

হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুখ-দিনের ঝড়ে।

যে প্রতীক্ষা নিয়ে কবি জেগে আছেন তা'র চমৎকার রূপটি ফু'টে [redacted] এর জাগরণ কবিতায়—

কৃষ্ণ পক্ষে আধখানা চাঁদ
উঠল অনেক রাতে,
খানিক কালো খানিক আলো
পড়্‌ল আঙিনাতে।
ওরে আমার নয়ন আমার
নয়ন নিদ্রাহারা,
আকাশ-পানে চেয়ে-চেয়ে
কত গুন্‌বি তারা?
সাড়া কারো নাইরে সবাই
ঘুমায় অকাতরে।
প্রদীপগুলি নিবে গেল
দুয়ার-দেওয়া ঘরে।
তুই কেন আজ বেড়াস্ ফিরি'
আলোয় অন্ধকারে?
তুই কেন আজ দেখিস্ চেয়ে
বনপথের পারে?

বৈষ্ণব কবির রাধার প্রতীক্ষার চাইতে একহিসাবে নিবিড়তর এই খেয়ার প্রতীক্ষা। বৈষ্ণব কবির অনুভূতি নিশ্চয়ই অতি গভীর, কিন্তু জীবনের জটিলতা তাঁর সাম্‌নে কম; কেমন [redacted]

প্রতীক্ষার ভিতর দিয়ে তিনি কেমন সহজ অথচ গভীর মিলনে পৌঁছুতে পার্‌ছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের—আধুনিকেরও বটে—প্রতীক্ষা বড় আশ্চর্য্য। দেবতার যৌবন নিয়ে একসময়ে যিনি উর্ব্বশীর নৃত্য উপভোগ করেছেন, বিজয়িনীর বিজয় চেয়ে দেখেছেন। গভীর জ্ঞানকে আত্মসাৎ ক'রে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে যিনি ঘোষণা করেছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,"

অথবা—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথ
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত…,

সেই বলীয়ান-হৃদয় কবি আজ বিরাটের প্রেমের আকর্ষণে নব-অনুরাগিণী কিশোরীর মতন কাঁপছেন! ভাষার যত দীপ্তি, উচ্ছ্বাস, কল্পনার উদ্দামতা, সে-সব আজ কোথায়? একেবারে শাদা কথায় হৃদয়টি অনাবৃত করবার জন্য কবি ব্যাকুল! *

* সর্‌কশ্‌ মশো কেহ্‌ শা'ম আজ্‌ শায়রাত্তৎ বসুজদ্‌।
দিল্‌বর্‌ কে দর্‌ কফে উ মোমাস্ত সংগে খারা ॥ — হাফেজ ॥
উন্নত-শির হয়ো না, মোমবাতির মতো জল্‌বে।
চিত্তহারী এমন যে তার হাতে পড়ে' শিলা মোম হয়।

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলিতে দেখা যাচ্ছে, খেয়ার এই প্রতীক্ষা কান্নায় ফেটে পড়্‌তে চাচ্ছে—

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো !
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

গীতাঞ্জলির প্রায় সব জায়গায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কবি বিরহের ব্যথা বড় গভীর ক'রে অনুভব কর্‌ছেন। সেই বিরহের ভিতরেই কখনো-কখনো প্রিয়তমের কেমন-একটুখানি সান্নিধ্যও লাভ কর্‌তে পার্‌ছেন।

বাঞ্ছিত-সম্বন্ধে নানা কথাই কবির মনে জাগ্‌ছে, বড় মাধুর্য্য-মাখা সেই সব কথা। কখনো বল্‌ছেন—

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চল্‌বে না।
এবার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বোসো
কেউ জান্‌বে না কেউ বল্‌বে না। (২৪)

তিনি জানেন, তাঁর হৃদয় এখনো তাঁর চরণস্পর্শে ধন্য হবার মতো হয়নি,—

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,

কিন্তু এ কথা বল্‌বার অধিকার কবি পেয়েছেন—

সখা তোমার হাওয়া লাগ্‌লে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গল্‌বে না?

আর এ যে-সে অধিকার নয়।

মাঝে-মাঝে কবি অদ্ভুত আব্‌দারে কথা বলছেন—

মুখ ফিরিয়ে রবো তোমার পানে
এই ইচ্ছাটি সফল করো প্রাণে। (৯৯)

কখনো অজানিতভাবে তাঁর ক্ষণিক স্পর্শ লাভ করে সচেতন হ'য়ে কবি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন—

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি! (৬২)

ধরা যেতে পারে বিরহের বেদনাই গীতাঞ্জলির মূল সুর, আর রীতিমত তীব্র সে বেদনা।

কবি প্রায় সব অবস্থায়ই এই বিরহের বেদনা অনুভব করছেন। প্রভাতে জেগে উঠে বল্‌ছেন,—

সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ বরণ পারিজাত ল'য়ে হাতে। (৬৮)

মেঘলা দিনে বল্‌ছেন,—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখো
একা দ্বারের পাশে। (১৭)

বৃষ্টির মাতামাতি দেখে তিনি বল্‌ছেন—

ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ঐ ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে। (২৮)

ম্লান বৈকালে তাঁর মনে পড়্‌ছে—

এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসা যাওয়া
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ
উতল হাওয়া।
জানি না আর ফির্‌ব কিনা
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে। (১৭)

ঝড়ের রাতে তিনি আকুল হয়ে ভাবছেন—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার। (২১)

আর সব অবস্থাতেই তাঁর মনে জাগ্‌ছে—

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে। (২৯)

গীতাঞ্জলিতে কবির দুই ভাবের সাধনা আমরা লক্ষ্য করি। একবার তিনি বল্‌ছেন—

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত সেথায় খোলো দ্বার,
আজ লবো তাঁর দেখা। (৫১)

আর-বার বল্‌ছেন—

ভজনপূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে? (১২০)

অথবা—

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়ক বনে নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপন মনে,

সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো। (৯৫)

এর ভিন্ন-ভিন্ন পরিণতি আমরা গীতিমাল্যে, আর গীতালি-বলাকা-পলাতকায় দেখ্‌তে পাই।

গীতাঞ্জলির এই বিরহ বৈষ্ণব বা স্থফীর বিরহের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। প্রকৃত বৈষ্ণব চমৎকার প্রেমিক, তাই প্রেমের ব্যথা রবীন্দ্রনাথ যখন অনুভব করেছেন তখন বৈষ্ণবের ভাবটি মাঝে-মাঝে তাঁর ভিতরে যে ফুটে উঠ্‌বে এটি স্বাভাবিক। রাধিকার ভাবটি গীতাঞ্জলির অনেক জাগায়ই বেশ ফুটে উঠেছে। এমন-কি কেউ যদি বলেন, বৈষ্ণবের প্রেমের ভাবটিই গীতাঞ্জলিতে বেশী প্রস্ফুট, তা হলে তাঁর সঙ্গে তর্ক না কর্‌লেও চলে। তবু একথা বল্‌তেই হবে, মোটের উপর বৈষ্ণবের প্রেমের ধাত রবীন্দ্রনাথের নয়। বৈষ্ণব মুর্ত্তি-বাদী, রাধাকৃষ্ণ এক স্থন্দর রসঘন বিগ্রহ ব'লেই বৈষ্ণব তা অবলম্বন করে আনন্দ পান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রহস্যময়ের পূজারি। সে রহস্যময় তাঁর কাছে "জলে স্থলে" "নানা আকারে" ধরা দেন। কবি নিজের গাঢ় অনুভূতিতে কখনো তাঁর চরণ ছুঁতে পার্‌ছেন। কখনো মৃত্যুর বেশে তিনি কবির মনোনেত্রে আবির্ভূত হচ্ছেন।

এই জন্যই স্থফীর আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গেও তাঁর কিছু অমিল রয়েছে। স্থফীও পীর মানেন, শাস্ত্রের সত্যকে জীবনে

উপলব্ধি কর্‌তে চেষ্টা করেন। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের সাধনায় নূতনত্বই বেশী করে চোখে পড়ে।

ইয়োরোপ তাঁকে বলেছে 'মিস্‌টিক' (Mystic)। কিন্তু মিস্‌টিক বল্‌লে তাঁর বিশেষত্ব-নির্দ্দেশ পূরোপূরি [redacted] না, কেননা এ-কথাটি খুবই ব্যাপক। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থও (Wordsworth) Mystic, 'এমার্সন'ও (Emerson) Mystic আবার ব্লেক'ও (Blake) Mystic. শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত Mystic-এর এক সংজ্ঞা দিয়েছেন—"তার কাছে মধ্যাহ্নের তপন বড় রূঢ় রুক্ষ, সে ভালোবাসে ছায়া-আলোর মিশ্রণ।" এক শ্রেণীর Mystic সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ-কথাটি খাটে না। তাঁর সন্ধানের তীব্রতা অনুভূতির গাঢ়তা আর প্রকাশের পর্য্যাপ্তি প্রায় সব জায়গায় চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ Mystic এই হিসাবে যে সত্যের চিররহস্যময় দ্বারে তিনি উঁকি মেরেছেন। সেই হিসাবে হয়ত শক্তিমান-মাত্রেরই জীবনের অন্তস্থলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় Mysticism.

বৈষ্ণবের 'সহজ ভক্তি'র সুর রবীন্দ্রনাথে পান না বলে অনেক-কে দুঃখ কর্‌তে দেখেছি। তাঁরা ভুলে যান, মানুষের জীবন বিচিত্র, জীবনের সার্থকতাও বিচিত্র। তা ছাড়া, অপরের পরিচয় যখন আমরা পেতে যাই তখন আমাদের উচিত, নিজেদের খেয়াল রুচি ইত্যাদি একটুখানি চেপে রাখা। এই জ্ঞানী মানী সুসভ্য কবি যখন বল্‌ছেন—

জড়িয়ে গেছে সরু-মোটা
দুটো তারে
জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই
বাজেনা রে (১২৯)

তখন, কি দুঃখে তাঁর হৃদয়ে এই দারুণ অস্বস্তি বাজছে, কি সত্য রয়েছে এর ভিতরে,—সেই সমস্তের অনুসরণই কি সত্য-অনুসরণ নয় ? যাঁরা "সহজ অধিকারে" ডুব দিয়ে অতলে তলিয়ে যেতে পেরেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। (অবশ্য "সহজ অধিকার" বলে' কোনো কিছু আদৌ আছে কিনা তাও বিচারের বিষয়।) কিন্তু যিনি তেম্‌নি ক'রে নিজেকে তলিয়ে দিতে পার্‌ছেন না, অথচ অতলের জন্য প্রাণ তাঁর আকুল হয়ে উঠেছে, তাঁর সেই আকুলতায়ও ত বিশ্ববিধাতার এক চমৎকার লীলা। মানুষের পক্ষে তা একতিলও অসত্য নয়। তার উপর খেয়া গীতাঞ্জলি গীতামাল্য শুধু বিরহীর কান্নাই নয়, এসমস্তে ফুটে উঠেছে এক নব বিরহ-মূর্ত্তি। এই সমস্ত কাব্যের অনেক কবিতা যে ইয়োরোপের আধুনিক ভাবুক মনীষীদের হৃদয় স্পর্শ করেছে সেও এই জন্যেই।*

গীতিমাল্য

গীতাঞ্জলির যে কান্না, গীতিমাল্যে তা থেমে যায়নি। কিন্তু সে অশ্রুর এখন [redacted] নতুন বেশ। এ তীব্র বেদনার অশ্রু নয়,

* গীতিমাল্যের "কেন চোখের [redacted] ভিজিয়ে দিলেম না" শীর্ষক কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অশ্রুর ভিতর দিয়ে কবি-হৃদয়ের কেমন-এক স্নিগ্ধ শান্তি চোখে পড়ে,—যেন বৃষ্টিতে-ভেজা টগর। গীতাঞ্জলিতে ঝড়ের রাত্রে কবি বলেছেন—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার···,

আর গীতিমাল্যে বলেছেন—

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই ত তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব যে হয়ে গেল কালো
নিবে গেল দীপের আলো
আকাশ পানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে।
অন্ধকারে রইনু প'ড়ে
স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি?
সকাল বেলায় চেয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি,
ঘরভরা মোর শূন্যতারি
বুকের পরে॥ (৬৭)

কবির অন্তরের ব্যথা ঘুচে যায়নি, কিন্তু অন্তরের তলে কেমন-একটু তৃপ্তি গীতিমাল্যের অনেকগুলি কবিতাকে সরস ক'রে রেখেছে—

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ। (৭)

কোলাহল ত বারণ হ'ল
এবার কথা কানে-কানে। (৮)

কে গো অন্তরতর সে?
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে। (২২)

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে গেছ হেসে। (৩৫)

ইত্যাদি।

ভক্তের যে সঙ্গোপনের পূজা সেইটিই গীতিমাল্যের মূল সুর। কবির যত কথা যত দুঃখ যত সার্থকতা যত আনন্দ একান্ত ক'রে তাঁকেই তিনি বল্‌ছেন—

লুকিয়ে আসো আঁধার রাতে
তুমি আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ॥ (৪৭)

গীতিমাল্যে কবি বড় খাদের পর্দ্দায় সুর বেঁধেছেন ; তাই তা পূরোপূরি উপভোগ কর্‌বার [redacted] খুব দরদীর কান চাই। সেই কান থাক্‌লে গীতিমাল্যে খুবই একটা গভীর তৃপ্তি অনুভব করা যায়। এই খাদের পর্দ্দাতে সময়-সময় কবির মনের কথা কি মর্ম্মস্পর্শী হয়ে বেজে উঠেছে !—

"এই যে তুমি" এই কথাটি
বল্‌ব আমি ব'লে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চ'লে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ আছ"র স্রোত ব'হে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গলে ॥ (১৪)

* * * *

যদি জান্‌তেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায়, আমি
কি জানি তার নাম।
... ...
এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধ'রে।
ভুবন ভ'রে আছে যেন
পাইনে জীবন ভ'রে।

সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তা'রে ক্ষণে-ক্ষণে,
গভীর সুরে "চাইনে, চাইনে,"
বাজে অবিশ্রাম ॥ (৫৭)

তখন মনে হয় এমন খাদের পর্দ্দায় সুর না ধরলে এমন অপূর্ব্ব গান শুন্‌বার সৌভাগ্য আমাদের হ'ত না।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার চেহারা গীতিমাল্যে অনেকখানি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। কোনো গুরু বা শাস্ত্র তাঁর পথ-প্রদর্শক নন। উপনিষৎ তাঁর প্রিয়, বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, দেশবিদেশের সাহিত্যমহারথীদের প্রতি তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা, তাঁর পিতার জীবনব্যাপী আধ্যাত্মিক বেদনা তাঁর অনুপ্রাণনার এক বড় উৎস; কিন্তু প্রকৃত গুরুর পদে বরণ তিনি কাউকেই করেন নাই। তাঁর অন্তরের অনুভূতিই বিশ্ব-গতের বুকের উপর দিয়ে তাঁর পথ দেখিয়ে চলেছে—

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাবো কাহার দ্বার?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারি কাছে
কথার কি তার অন্ত আছে।

যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকার। (৬২)

নিজের অন্তরের সত্যকার বেদনা যে কেমন ক'রে মানুষকে পথ দেখায়—চিরকাল মানুষকে পথ দেখিয়ে এসেছে—সে কথাটি অন্য এক কবিতায় বড় সুন্দর ক'রে বলা হয়েছে। মনে হয়, সমস্ত রবীন্দ্র-কাব্যে এ একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা—

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে।
* * *
আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি সুরে,
সেই গানের টানে পারো না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে-গান মম
ঝড়ের রাতের পাখী-সম,
বাহির হয়ে এস তুমি
অন্ধকারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে। ■ (৬৪)

■ কবীরও বলেছেন—

বাঁসুরি জব মোহে ডগরা ধরাঈ।
রয়না আন্‌হেরী রহি কারী বাদরন-সে

এর "ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো" শীর্ষক কবিতাটি বড় অদ্ভুত—

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো
তা'রে রাখ্‌তে নারি টানি। (১৯)

কোন্ চুম্বকের আকর্ষণে কবি-চিত্ত এমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে আমাদের পক্ষে তা বোঝা সহজ নয়। হাফেজও এক জায়গায় বলেছেন—

দিল্ মিরওদ জে দস্তম্
সাহিবদিলাঁ খোদারা। *

ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ ॥
ঠারী কোঈ দেখত আপন অঙন-সে
জিন্‌হে কভি বাঁহুরি বুলাঈ।
ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ ॥
ডর নাহি কুচ্ছো ডগরা না পুচ্ছো
বাঁহুরি সুনত কবীরা বঢ় জাঈ।
পীতম বুলাওত আন্‌হেরী-কি পার-সে
কৌন বেশরম আজ তোর সাথ জাঈ ॥

বাঁহুরি—বাঁশি; জব—যখন; মোহে—আমাকে; ডগরা—পথ; ধরাঈ—ধরিয়েছিল; রয়না—রাত্রি; আন্‌হেরী—অন্ধকার; কারী বাদরন-সে—কালো বাদলের দ্বারা; ঠারী—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে; কোঈ—কোনো কোনো পূর্ব্ব সাধক; সুনত—শুনতে শুনতে। বঢ় জাঈ—এগিয়ে যাও; পীতম—প্রিয়তম।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অপ্রকাশিত সংগ্রহ থেকে গৃহীত।

* হাত হতে মোর হৃদয় যায় দোহাই বাঁচাও হৃদয়বান্!—কবি [redacted] ইসলামের অনুবাদ।

সহজের সাধনায় কবি যে অনেকখানি এগিয়েছেন গীতিমাল্যের অনেকগুলি কবিতায় তার পরিচয় রয়েছে—

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে
জননীর মুখ তাকানো হাসিতে
সেই সুরে মোরে বাজাও। (৩৯)

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ?
সে-সুধা গড়িয়ে গেল লোকে-লোকে।
গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধ'রে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে।
পাখীরা পাখায় তারে নিল এঁকে। (১০৮)

* • ■

গীতিমাল্যের শেষের দিকে কতকগুলি কবিতায় দেখা যাচ্ছে, কবির বেদনা প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে, আর আনন্দ বেশ সজীব হয়ে উঠেছে—

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে,
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে।

পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়নে
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে।
নিশিদিন এই জীবনের সুখের পরে দুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে॥ (৬৮)

* * * *

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
সে আগুন ছড়িয়ে গেল
সবখানে।
যতসব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে
কার পানে॥ (৮৯)

বৈষ্ণবের সেই

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলা বাটে
আঙ্গিনার পরে তিতিছে বঁধুয়া
দেখে যে পরাণ ফাটে—

কবিতার সঙ্গে গীতিমাল্যের "কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না" শীর্ষক কবিতাটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। বৈষ্ণবের সরল হৃদয়, বাইরের বন্ধনই তাঁকে আকুল করেছে। তিনি কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন। কত মর্মস্পর্শী এই

তা কে না বুঝতে পারে?—কিন্তু গীতিমাল্যের কবির দুঃখ দেখছি একটু ভিন্ন রকমের।

তুমি পার হ'য়ে এসেছ মরু
নাই যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়,
এমন ভাগ্যহত! (৯১)

বাইরের তেমন-কোনো প্রতিবন্ধকতা তাঁকে দুঃখ দিচ্ছে না। তাঁর প্রিয়তমের আস্‌বার পথ রুদ্ধ হয়েছে তাঁর নিজের অন্তরের শুষ্কতার মরুতে—শিথিলপ্রযত্নতার মরুতে। আধুনিক কবির এই দুঃখ বিশেষ করে' আধুনিক জগতের লোকেরই দুঃখ, কেননা মানুষের এই ভিতরকার বন্ধনই আজ বেশী প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।*

এক যুগের কাব্যের ভিতরকার কথার সঙ্গে অন্য যুগের কাব্যের ভিতরকার কথার নিশ্চয়ই খুব বেশী মিল। তবু এক যুগের ভাবের অবলম্বন আর প্রকাশভঙ্গিমা অন্যযুগের ভাবের অবলম্বন আর প্রকাশভঙ্গিমা হ'তে বিভিন্ন হতে বাধ্য, নইলে ভিন্ন ভিন্ন যুগ বলে' কোনো কথাই থাকত না। অতীতের যাঁরা অন্ধ ভক্ত এ কথাটি তাঁদের স্মরণ রাখা দরকার।

গীতিমাল্যের শেষের কবিতায় কবি যে প্রণাম নিবেদন করেছেন কেমন-এক সার্থকতার আনন্দ রয়েছে তাতে—

*অন্ততঃ, বন্ধন যে চিরদিনই ভিতরকার, আধুনিক কবির ভাষায় সেটি বেশী পরিস্ফুট হয়ে' উঠেছে।

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার। (১১১)

গীতালি

কবির এত দিনের সব কান্না ব্যথা কেমন এক সার্থকতার শ্রীতে মণ্ডিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে গীতালিতে—

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নাম্‌ল
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌ল।

* * *

এত দিনে জান্‌লেম
যে কাঁদন কাঁদ্‌লেম
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য রে ধন্য। (১)

গীতালির প্রায় সব কবিতায়ই এই সুর—এই সার্থকতার স্থস্থির সুর।

ভক্ত কবি তাঁর চিরবাঞ্ছিতের সাম্‌নে বসে যে সব আব্‌দারের কথা বল্‌ছেন কত নিবিড় তা'র রসটি !—

বক্ষ আমার এমন করে'
  বিদীর্ণ যে করো
উৎস যদি না বাহিরায়
  হবে কেমনতরো ? (৩২)

অথবা

গর্ব্ব আমার নাই রহিল প্রভু,
চোখের জল ত কাড়্‌বে না কেউ কভু। (৬৪)

তাঁর হৃদয়-গৃহে-শয়ান প্রিয়তমকে জাগবার জন্য কবি যে ডাক্‌ছেন কোনো ব্যথা কোনো আশঙ্কা নেই সেই স্বরে। পূর্ণ বিশ্বাসে প্রাণ ভরে' তিনি বল্‌ছেন—

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে—
  প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কত কাল এমনে কাটিবে স্বামী—
  প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

… … …

মিলাবো নয়ন তব নয়নের সাথে
মিলাবো এ-হাত তব দক্ষিণ হাতে—

প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো! —

এখন সার্থকতার অঞ্জনে কবির দৃষ্টি আরো পরিষ্কার; আর প্রেমামৃত পানে তাঁর কণ্ঠ আরো সবল। তাই তাঁর এতদিনের আধ্যাত্মিক সাধনার যে বেদনা আর এখনকার যে আশা সে-সম্বন্ধে কবি বেশ দারাজ ঝঙ্কারে কথা বল্‌ছেন—

যখন তুমি বাঁধ্‌ছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা।
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা। (১৭)

গীতালিতে কতকগুলো উঁচুদরের কবিতা স্থান পেয়েছে—রূপ আর রসের দিক দিয়েই উঁচুদরের—

আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে
এজীবন
পুণ্য করো
—দহন দানে (১৮)

যে থাকে থাক্ না দ্বারে
যে যাবি যা না পারে।

... ...

কুঁড়ি চায় আঁধার রাতে
শিশিরের রসে মাতে।
ফোটাফুল চায় না নিশা
প্রাণে তার আলোর তৃষা
—কাঁদে সে অন্ধকারে। (২৩)

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন ক'রে?—
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
গানের ঘোরে। (৫৩)

পুষ্পদিয়ে মারো যারে
চিন্‌ল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে। (৭৩)

ইত্যাদি।

এর দুটি কবিতা গীতিমাল্যের সেই "ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো" শীর্ষক কবিতার মতনই আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্জ্ঞেয়। গুহ্য (Esoteric) সাধনা যাঁরা করেন তাঁরা হয়ত এ সমস্তের রস ভালো ক'রে উপভোগ কর্‌তে পারেন—

কোন্ সাহসে একেবারে
শিকল খুলে দিলি দ্বারে,

জোড় হাতে তুই ডাকিস কারে ?
প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে। (১০)

* * *

আমি যে আর সইতে পারিনে
সুর বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে। (১১)

* * *

যাঁর প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে কবি এতকাল কেঁদেছেন তাঁর সেই প্রেমকে কবি বলেছেন সর্ব্বনাশা। হাফেজও বলেছেন—

কস্ বদৌরে নার্গিসত্ তর্‌ফিনবস্ত আজ্ আফিয়াত। *

সত্যের যে সন্ধানী তাঁর আরাম-আয়েসে আগুনের স্পর্শ ই লাগে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা তাঁর কাছেও এই কথাটিরই আভাস বেশী করে' পেয়েছেন।

গীতালির "আবার যদি ইচ্ছা করো" শীর্ষক কবিতাটিও খুবই লক্ষ্যযোগ্য। কত অল্প কথায় কত বিস্তৃত আর রসময় ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! কবির এই ক্ষমতার আরো বেশী পরিচয় পাওয়া যায় এর পরে রচিত পলাতকায় আর বিশেষ

---

*তোমার নার্গিস-চোখের সামনে কারো সাধ্য নাই যে আরামে বসে' থাকে।

করে' লিপিকায়।—তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে চিরপরিচিত অতি বড় ধরণীর পানে চেয়ে কবি বলেছেন—

আবার যদি ইচ্ছা করো
    আবার আসি ফিরে
দুঃখ সুখের ঢেউ-খেলানো
    এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধূলার পরে করি খেলা
হাসির মায়া-মৃগীর পিছে
    ভাসি নয়ন-নীরে।
কাঁটার পথে আঁধার রাতে
    আবার যাত্রা করি;
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিম্বা
    আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে।
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
    আবার ধরণীরে।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার স্বরূপ গীতালিতে বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তিনি বলেন—

সেই ত আমি চাই!
সাধনা যে শেষ হবে মোর

সে ভাব্না ত নাই।

* * *

এম্‌নি করে' মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্যনূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন ব্যথা।

"নিত্যনূতন সাধনাতে নিত্যনূতন ব্যথা" সহ্য করার ভিতরে মুক্তির স্বাদ আছে। কবির জীবন এতেই ভোর হবে, না এমন দিন আস্‌বে যেদিন তাঁর প্রতিভা-নির্ঝরিণীর সব কলকল ভাষ সাগরসঙ্গমে নীরব হ'য়ে যাবে, কে তা বল্‌তে পারে? কিন্তু এই কবিতার অন্য জায়গায় তিনি যে বল্‌ছেন—

ফলের তরে নয়ত খোঁজা,
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধূলায় ফে'লে
আবার ফুল ফুটাই ···,

এটি অনেকখানি তাঁর ব্যক্তিগত সাধনার কথা হ'লেও এর ভিতরে একটি বড় সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে।

আধ্যাত্মিক সাধনায় যাঁদের উপলব্ধি তত্ত্ব-আকারে, অনুশাসন-আকারে ফলের মতন দেখা দিয়েছে, তাঁদের মাহাত্ম্য ইতিহাসে কীর্ত্তিত হয়েছে। অবতার-পয়গম্বররূপে, শাস্ত্রকাররূপে, পথ-প্রদর্শক গুরুরূপে তাঁরা মানুষের পূজা পেয়েছেন। তাঁদের

মাহাত্ম্য যে অসাধারণ একথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু একদিকে যেমন রয়েছে তাঁদের প্রতিভার উজ্জ্বলতা, তেম্‌নি অন্যদিকে দেখা যায় দুর্ব্বল লোকের জীবনে তাঁদের প্রভাবের বিকারের অন্ধকার। তাঁদের আবিষ্কৃত যে-সব তত্ত্ব যে-সব উপদেশ তাঁরা মানুষকে দিয়েছেন, সে-সব কালে-কালে মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচারই করেছে। জগতের সব ধর্ম্মের ইতিহাসই বহুল পরিমাণে এই ফলের বিষম বোঝার দৌরাত্ম্যের ইতিহাস নয় কি? অনন্ত তত্ত্ব, অনন্ত সৌন্দর্য্যের নিলয়, যে ভগবান্ তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর বিশেষ আনন্দ বিশেষ উদ্দেশ্য প্রকাশিত যে অবতারে পয়গম্বরে, মানুষ তাঁদেরই জীবনের সব অবস্থার অবলম্বনরূপে বেশী করে' চেপে ধরে নেই কি? মানুষের সব ব্যাপারেই এই গুরুর অত্যাচার আদর্শের অত্যাচার—সাধনার ফলের 'বিষম বোঝা'র অত্যাচার।

এখন অবশ্য এই গুরুগিরির অত্যাচার আস্তে-আস্তে হাল্‌কা হবার পথে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা রাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে গুরু এখন বন্ধু হ'য়ে উঠেছেন—অন্ততঃ সে-সত্য স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন যে ধর্ম্ম—ভগবৎ-উপলব্ধি—সেখানেও যে গুরু শুধু বন্ধু, অবতার পয়গম্বর প্রাচীন আদর্শ সবাই বন্ধু, একটুখানি সহায়, তা'র বেশী নয়, তা'র বেশী হ'লে তাঁরা যে মানুষের উপর দৌরাত্ম্য করেন, তাদের জীবনে সত্যকার ফুল ফোটাবার সুযোগ নষ্ট করে দেন—দেখা যাচ্ছে, এই আশ্চর্য্য সন্ধানী মানুষের বড় কামনার ধন সেই সত্যকে নিজের জীবনে

উপলব্ধি করে' মানুষকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনাকে তত্ত্ব-আকারে অনুশাসন-আকারে জমিয়ে তুলতে তাঁর কত সঙ্কোচ!

ফলের তরে নয়ত খোঁজা,
কে বইবে সে বিষম বোঝা!

একহিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-জীবনই বিশ্ব-মানবের কাছে এই সংস্কার-মুক্তির উপহার,—ইতিহাসের ধারায় সহস্র-সংস্কারে-বদ্ধ মনুষ্যের ভিতরেও অনুভব করা যায় যে অবন্ধনের চমৎকারিত্ব, তা'রই মূর্ত্ত মহিমা। *

---

* চতুরঙ্গের শচীশ বলছেন—আমার অন্তর্য্যামী কেবল আমার পথ দিয়েই আনাগোনা করেন।

তৃতীয় পর্য্যায়

গীতালিতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার বেশ একটা সার্থকতা লাভ হয়েছে, আমরা দেখেছি। এই সার্থকতার রসে কবি নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে পারতেন—অর্থাৎ অনেক ভক্ত তা পেরেছেন। তা হ'লে তাঁর গানে হয়ত অনুভব করতে পারা যেত হাফেজ বা কবীরের জমাট মিলনানন্দ। কিন্তু তা না পেয়ে আমরা দুঃখিত নই, কেননা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, স্বয়ং কবি এর জন্য দুঃখিত নন। তিনি আর কিছুর সন্ধান পেয়েছেন আর এক অপূর্ব্ব মমতার সঙ্গে সে-পথ অনুসরণ করে' চলেছেন।

গীতালির এই সার্থকতার সবলতায় কবি অনুভব করছেন গতির আনন্দ। তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরেই গতি যথেষ্ট তূর্ণ—হিল্লোলিত ত বটেই। এখনকার এই দৃষ্টির আর চিত্তের সবলতায় কবি প্রত্যক্ষ করছেন তাঁর সেই আজীবন পথিক-রূপ—

আমি পথিক পথ আমারই সাথী।

* * * *

বাহির হ'লেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

*   *   *   *

ঐ যে, ওদের কালো মেয়ে নন্দরাণী
যেমনতর ওর ভাঙা ঐ জান্‌লাখানি,
যেখানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশতলে দিশাহারা ;
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে কর্‌ত খেলা আলসভরে ;
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী ;
তেম্‌নি আমার বাঁশের বাঁশি আপন-ভোলা
চারদিকে মোর চাপা দেয়াল, ঐ বাঁশিটি আমার জান্‌লা খোলা।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা,
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা।
যে কথাটা কান্না হ'য়ে বোবার মতো ঘু'রে বেড়ায় বুকে
উঠ্‌ল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই পাওয়া।

এই এক অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গলাভ আমরা এতক্ষণ কর্‌লাম, বলা যেতে পারে,—নিত্য জাগরণ যার ধর্ম্ম। বাঙালীর ভবিষ্যৎ হয়ত মন্দ নয় ; এক শত বৎসরের ভিতরে বাঙালীর ঘরে জন্মেছেন রামমোহন, মধুসূদন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ। এঁদের

এক জনকে এক শত বৎসরে পেলে একটি সমাজ নিজেকে ধন্য মনে করতে পারে।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে যে প্রভাবান্বিত সে কথা বল্‌বার দর্‌কার করে না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-প্রতিভার চাকচিক্যেই যে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে রয়েছি, তা'র প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে তেমন প্রবল হয় নি—এ কথা ভাববার সময় এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্ববিখ্যাত পুরুষ। তাঁর খ্যাতিতে বাঙালী গৌরবান্বিত। কিন্তু তাঁর এ খ্যাতিকে সত্যকার খ্যাতিতে রূপান্তরিত কর্‌বার, অর্থাৎ, তাঁর প্রতিভাকে একটা জাতির জীবনের বস্তু ক'রে তা'কে সার্থকতা দান কর্‌বার, শ্রেষ্ঠ অধিকার যে বাঙালীরই আছে এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না। বাঙালীর অত্যন্ত অসম্পূর্ণ জাতীয়জীবন ও সাহিত্যের জন্য এর প্রয়োজন বড় বেশী।

রবীন্দ্রনাথের বহু সুন্দর সৃষ্টির সামান্য সামান্য পরিচয় আমরা এতক্ষণ পেয়েছি। কিন্তু তাঁর সমগ্র কাব্যশতদল আশ্রয় ক'রে ফু'টে রয়েছে যে এক মহিমান্বিত প্রতিভা, বিধাতার হাতের সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টির মাহাত্ম্য উপলব্ধির অধিকারী—শ্রদ্ধাবান্‌ মার্জ্জিতবুদ্ধি শ্রম-অকাতর পাঠক।

সমাপ্ত

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম-এ প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ।

১। নব পর্য্যায়—৮০ ও ১৲

মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, সাহিত্যে সমস্যা, "মানব-মুকুট", পণ্ডিত সাহেব, কাজি ইমদাদ-উল-হক স্মরণে, সৃষ্টির কথা, সম্মোহিত মুসলমান, এই কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি।

আনন্দ বাজার পত্রিকা বলেন :—

…গ্রন্থখানি সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।…

২। নদীবক্ষে—১৷৹

রবীন্দ্রনাথ বলেন :—

আপনার লিখিত "নদীবক্ষে" উপন্যাসখানিতে মুসলমান চাষী গৃহস্থের যে সরল জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকদের কাছে খুলিয়া দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকত্ব, সরলতা, ও নূতনত্বে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি, এই জন্যে আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন।

৩। মীর পরিবার ও অন্যান্য গল্প—১৲

শরৎচন্দ্র বলেন :—

…বই উপহার পাইয়া গ্রন্থকারকে দুটা ভাল কথা বলিতে, সর্ব্বান্তঃকরণে উৎসাহ দিতে পারি না বলিয়া আমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। আপনি সেই সুযোগ আমাকে দিয়াছেন বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সত্যই আমি ভারি খুসি হইয়াছি।…

৪। নব পর্য্যায় (দ্বিতীয় খণ্ড)—

নেতা রামমোহন, মিলনের কথা, বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা, "অভিভাষণ," ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহাম, ডায়রির এক পৃষ্ঠা, এই কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। (১৯২৮ সালের মার্চ্চে প্রকাশিত হইবে।)